ইচ্ছামতী

শরৎ সংখ্যা ২০০৯

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃশরত সংখ্যা ২০০৯.....1
পুজোর চিঠি.....4
শরতের কথা: অকাল বোধন.....10
উজ্জ্বল অধ্যায়: পর্ব ১.....13
ছড়া-কবিতা.....15
দুগ্‌গা ঠাকুর আসে.....15
চার বোন ভাই, ব্যস্ত সদাই 16
পুজোর ছড়া.....17
ঝড়ের ছবি.....18
ফুল ছিঁড়ো না.....20
ইচ্ছে মতন: সিংহের শিকার ধরা.....21
গল্প-স্বল্প.....25
যে সয় সে রয়.....25
ঝালং.....40
তিতলি আর মিনি.....44
লালকন্ঠের স্বপ্নপূরণ.....50
আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৫.....55
মনের মানুষ: রূপকথার ভান্ডারী.....60
পড়ে পাওয়া: কলাবতী রাজকন্যা.....62
দেশে-বিদেশে: সোনালি ঢেউয়ের দেশে.....64
ছবির খবর: হীরের আংটি.....72
বায়োস্কোপের বারোকথা: হাসি কান্নার জাদুকর.....76
পরশমণি: রান্নাঘরে আরেকবার.....82
জানা-অজানা: মারথোমা নাসরানিদের দেশে.....84
কমিক্‌স্‌ কাহিনী: নারায়ণ দি গ্রেট.....90
এক্কা-দোক্কা: ম্যারাথনের মোকাবিলা.....94
আঁকিবুকি.....99

প্রথম পাতাঃশরত সংখ্যা ২০০৯

ঝমঝম বৃষ্টির দিন শেষ। মাঝে মাঝে এক আধ পশলা পড়ছে ঠিকই, কিন্তু আকাশ প্রায় পরিষ্কার - একটা খুশি খুশি নীল রঙের জামা পড়ে ফেলেছে। জলভরা ছাই ছাই মেঘের ফাঁকে ফাঁকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পেঁজা তুলোর মতো সাদা সাদা শরতের মেঘ। যদিও এখনও খুব গরম, তবুও সকাল বেলার ঝকঝকে, সোনালি রোদ বেশ ভালোই লাগছে। বাগানে ফুটছে গোলাপি-বেগুনি রঙের দোপাটি, হলুদ কল্‌কে। আর সন্ধ্যাবেলা? পথ চলতে চলতে হটাত করে ভেসে আসছে মন কেমন করা শিউলি ফুলের গন্ধ। ভোরবেলা সেই সাদা-কমলা শিউলিগুলিই ছড়িয়ে থাকছে গাছের তলায়, সবুজ ঘাসের বুকে। পাড়ার মোড়ে, অথবা স্কুল যাওয়ার পথে হঠাত করে চোখে পড়ছে বাঁশের কাঠামো। কিসের বলতো?- কিসের আবার - দুর্গাপুজোর মন্ডপের! - পুজোর যে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি।

এবার অবশ্য পুজো অনেক আগেই চলে এসেছে। একেবারে বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিনই মহালয়া!!

অন্যান্যবার মোটামুটি মাসখানেকের ফারাক থাকে। বেশ বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি উড়িয়ে, প্রসাদ খেয়ে পুজো আসছে-পুজো আসছে ভাবতে ভাবতে, আর কবে ছুটি পড়বে হিসাব করতে করতে, এক মাস কোথা দিয়ে যেন হুশ করে কেটে যায়। এবার আর অতশত সময় নেই। মা দুর্গার বাপের বাড়ি তাড়াতাড়ি আসার মনে হয় খুব খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো। তাই বিশ্বকর্মা ঠাকুরের পেছন পেছনই ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে আসছেন বাপের বাড়ি। তুমি তৈরি তো? নতুন জামা পরে মা দুগগার সাথে দেখা করার জন্য? প্রচুর হাঁটতে হবে কিন্তু, নানা জায়গার মন্ডপ ঘুরে দেখতে দেখতে; একেক জায়গায় মায়ের একেকরকম রূপ - কোথাও তিনি করুণাময়ী রূপে, কোথাও বা রুদ্রমূর্তি, কোথাও খুব জমকালো সাজগোজ, কোথাও আবার সেই সনাতনী ডাকের সাজ, কোথাও সাবেকি একচালার মূর্তি, কোথাও বা ভিনরাজ্যের সাজে সেজে ওঠা মায়ের মূর্তি। দেখতে দেখতে পায়ে ব্যথা হয়ে গেলে, একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে আইসক্রিম, ফুচকা, ঝালমুড়ি; মাঝে মাঝে বড়দের কাছে আবদার করে নাগরদোলা, অথবা পাড়ার মন্ডপে বন্ধুদের সঙ্গে ঢাক বাজানোর প্রতিযোগিতা। এদিকে আবার সবে কেটে গেলো খুশির ঈদ, আর দুর্গাপুজো শেষ হতে না হতেই সামনে আসছে লক্ষ্মীপুজো। এই কয়েকটা দিন ভারি আনন্দের, তাই না?

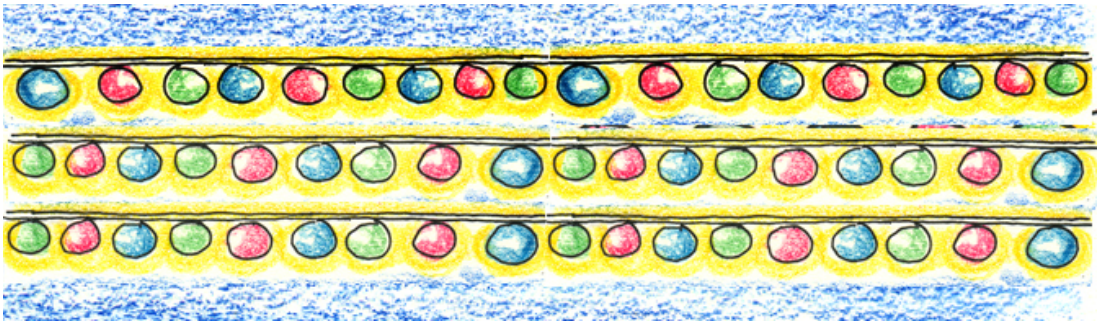

নতুন জামা, জুতো, উপহারের সাথে সাথে তোমার জন্য এসে গেলো ইচ্ছামতীর নতুন সংখ্যা শরত সংখ্যা ২০০৯। এই পুজোয় ইচ্ছামতী কিন্তু এক বছরে পা দিলো। এই এক বছরে ছোট-বড় সব বয়সী পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ছোট্ট ইচ্ছামতী পেয়েছে অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা আর উতসাহ। এই পুজোতে তাই ইচ্ছামতী তোমার জন্য নিয়ে এসেছে বেশ কয়েকটা গল্প, ছড়া, এবং আরো কিছু বিশেষ আকর্ষণ। এই সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে জনপ্রিয় ছড়াকার ও কার্টুন-শিল্পী রেবতীভূষণের আঁকা ছবি ও লেখা দিইয়ে সাজানো বিশেষ বিভাগ 'উজ্জ্বল অধ্যায়'। তাঁর আঁকা ছবি ও ছোটদের জন্য লেখাগুলি ইচ্ছামতীকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁর পরিবারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আছে আমাদের অতি পরিচিত দুই প্রখ্যাত কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ও শ্যামলকান্তি দাসের লেখা ছড়া। ইচ্ছামতীর প্রথম পুজো সংখ্যাকে তাঁদের সৃষ্টিতে সাজিয়ে তুলতে পেরে আমরা আনন্দিত। আছে বিভিন্ন স্বাদের চারটি গল্প, আর 'ইচ্ছেমতন' বিভাগে আছে ক্ষুদে লেখক ঋক ঘোষের ছবি সহ লেখা গল্প - অবশ্যই পড়ো কিন্তু। এছাড়া থাকছে নতুন নতুন মনের খোরাক নিয়ে নিয়মিত সব বিভাগ। আর আছে 'পুজোর চিঠি' আর 'শরতের কথা'। ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি তোমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য একেবারে তৈরি ইচ্ছামতী।

জানো তো, লৌকিক মতে, মা দুর্গা প্রতি বছর বিভিন্ন বাহনে করে মর্ত্যে আসেন এবং কৈলাশে ফিরে যান। এবার দুর্গা বাপের বাড়ি আসছেন দোলায় চেপে, যার ফল কিনা মড়ক। সত্যি করে মড়ক হোক আর না হোক, আমাদের চারিদিকে কিন্তু অনেক মানুষই খুব কষ্টে আছেন। খবরের কাগজে হয়ত পড়ে থাকবে, বা টেলিভিশনে দেখে থাকবে - সারা দেশের নানা জায়গায় হচ্ছে ভয়ানক বন্যা, ডুবে গেছে

ঠিক তোমার মত কত ছোটদের ঘর-বাড়ি। অন্যদিকে কোথাও আবার অনাবৃষ্টি, খরা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্ষেতের পাকা ধান, জলের তোড়ে ভেসে গেছে কমলি গাই, ভাংছে নদির পাড়, নেই তেষ্টার জল বা মাথার ওপরে ছাত। পুজোর আনন্দের মাঝে মাঝে কিন্তু এইসব মানুষদের ভুলে যেওনা। অষ্টমীর সকালে যখন মা দুর্গার কাছে অঞ্জলি দিয়ে মনে মনে নিজের পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট বা নতুন সাইকেল অথবা ভিডিওগেম চাইবে, তখন কিন্তু এইসব অগুন্তি মানুষের জন্যেও চেয়ে নিও মুখের হাসি, পেট ভরা খাবার, মাথা গোঁজার আশ্রয়। তবেই না তোমার পুজো হয়ে উঠবে সত্যিকারের আনন্দ উতসব।

মনটা কি অল্প খারাপ হয়ে গেলো? আচ্ছা, মন ভালো করার জন্য অন্য একটা খবর দিই। মা দুর্গা কিন্তু এবার ফিরে যাচ্ছেন হাতির পিঠে চেপে, যার ফল হল 'শস্যপূর্ন বসুন্ধরা' - মানে কি বলতো? এর মানে হলো যে চলে যাওয়ার সময়ে মা কিন্তু পৃথিবীর কোল ভরে দিয়ে যাবেন সবুজ শস্যে - সবার জন্য থাকবে একমুঠি খাবার! -এই কথা ভাবলেই তো মন অনেক ভালো হয়ে যায়। এখন আর অতটা মন খারাপ হচ্ছে না তো? আসলে তিনি তো সবার মা, তাই যেমন মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করার জন্য কড়া শাসন করেন, আবার ঠিক ততটাই ভালোবাসেন আমাদের সব্বাইকে। তাই তো তিনি মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী।

তাই বলি, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধ, প্রসাদ আর ভোগের স্বাদ, ঢাকের বাদ্যি আর সমবেত মন্ত্রের শব্দ, নতুন জামা আর বেলুনের রঙ, সব মিলে মিশে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ুক এক নতুন আলো, কেটে যাক সব অন্ধকার।

দুগগা ঠাকুর ভালো
তাঁর রূপে ভুবন আলো

এসো, সেই আলোয় পথ দেখে, মায়ের হাত ধরে, আরেকবার নতুন করে সবাইকে ভালোবাসতে শিখি আমরা...

চাঁদের বুড়ি

দুর্গার ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়

পুজোর চিঠি

সারা রাতের ট্রেনের ধকল ছিলো। ঘুমও হয়নি ভালো করে। ঝম ঝমে বৃষ্টির মধ্যে যখন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ছিলাম তখন ভাবতেও পারিনি রাত দশটা পাঁচের দার্জিলিং মেলটা ধরতে পারবো। শিয়ালদহ থেকে তড়িঘড়ি ট্রেনে উঠে দেখি গোটা কামরা জলে থৈ থৈ। জল পরিষ্কার করে, আমার জিনিসপত্র রেখে, সব দিক দেখে শুনে, ধীরে-সুস্থে বসতে বসতে অনেক দেরী হয়ে গেলো। তখোনো তোমার চিঠিটা আমার ব্যাগে সিরাজুল। খোলা হয়নি নীল খামটাও।

রফিকুল ক্যানিং লোকাল থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে এসেছিলো। ভেবেছিলো আমার ট্রেন হয়তো ছেড়ে গেছে। হাঁপাচ্ছিলো রফিকুল। ও এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। শুনলাম তোমাদের গ্রামে আবার নদীর জল ঢুকছে হু হু করে। তোমার ছোট্ট বোনকে নিয়ে মা চলে গেছেন মামার বাড়ি,পবিত্র রমজানে আনন্দের ছিটেফোঁটাটুকু নেই। রফিকুলের দেওয়া টুকরো টুকরো খবরে আমার মন যখন একটু একটু করে কষ্ট পাচ্ছে তখন দেখি ট্রেনের কামরার সহযাত্রীরা একটুখানি জল দেখেই কি হই-চই বাধিয়ে ফেলেছে। আর আমার মনে পড়ছে তোমার গ্রামকে। সুন্দরবনের সেই ছোট্ট গ্রাম পাখিরালার কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম সিরাজুল।

সিরাজুলের গ্রাম

সকাল ঠিক আটটার সময় দার্জিলিংমেল আমাদের নামিয়ে দিলো নিউ জলাপাইগুড়ি স্টেশনে। সারা রাতের ক্লান্তি এক নিমেষে উধাও হলো যখন দেখতে পেলাম ঝকঝকে শরতের রোদে ভেসে যাচ্ছে স্টেশন চত্বর। বেশ কিছু বিদেশী ট্যুরিস্ট নিজেদের মধ্যে হৈ-হৈ করছে। আর ছোট ছোট জিপ থেকে চালকরা জোরে জোরে হাঁক দিচ্ছে "কালিম্পং, দার্জিলিং,ফুন্টসিলিং..."। তোমার বয়সী একদল স্কুলের ছেলে মেয়ে কালিম্পঙের বাসটায় উঠলো। আর ঠিক তখনি আমার গাড়ির চালক জয়কে দেখতে পেলাম। হাসি-খুশি জয় সবসময় আমার সফর-সঙ্গী।

আমরা যাবো শিলিগুড়ির খুব কাছেই সরস্বতীপুরে। সেখানে কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের পাশেই থাকে মালতী নার্জিনারী। ঠিক ধরেছো সিরাজুল, মালতী তোমার মতো ক্লাস সেভেনে পড়ে। যাওয়ার পথে হঠাত গাড়ি থামালো জয়। তাকিয়ে দেখি তিস্তার চর সেজে উঠেছে কাশফুলে। মনে পড়ে গেলো পুজোর আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি।

তিস্তার চরে কাশফুল

কাঁঠালগুড়িতে গিয়ে মালতীর দেখা পেলাম না। শুনলাম মামার বাড়ি গেছে। অতদূর থেকে এসেছি বুঝতে পেরে শুক্লা ওরাঁও বললেন,"একটু বসুন, আমি আপনাদের গ্রামটা ঘুরে দেখাই।" তিস্তার পাশে জঙ্গল আর চা বাগানে ঘেরা মেচ আর ওরাঁও জনজাতির গ্রাম। শুক্লার সাথে গ্রাম ঘুরতে গিয়ে দেখলাম সবাই চা-পাতা তোলার কাজে ব্যস্ত। কেউ কেউ জঙ্গল থেকে বয়ে নিয়ে আসছেন শুকনো কাঠ।

চা বাগান

খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার চলা শুরু করলাম। যেতে হবে অনেকটা পথ। রাজাভাতখাওয়া ছাড়িয়ে আরও ঘন্টা দুয়েকের পথ। সন্ধ্যা নামছে। বড় রাস্তা থেকে জঙ্গলে ওঠার মুখে জয় আবার গাড়ি থামালো। আমরা সবাই চুপ। আকাশে নানা রকমের রঙ ছড়িয়ে সূর্যিমামা পাটে নামছেন। এরপরে জঙ্গল, পথে পড়বে রায়ডাক নদী।

সূর্যাস্ত

সিরাজুল, তোমার গ্রামে যখন রাতে ছিলাম তখন মনে আছে বাজারের সেই অন্ধকার পথটা? তুমি আমাকে চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে। অনেক রাতে ঘুম থেকে তুলে আমাকে শুনিয়েছিলে হাড় হিম করা বাঘের ডাক। মাগো, সেদিন কি ভয় পেয়েছিলাম! মনে আছে সিরাজুল? আর সেই লস্কর মন্ডল, টাইগার রিজার্ভের বনরক্ষী। যিনি আমাদের সেই রাতেই নিয়ে গিয়েছিলেন নৌকাতে। আর সারা রাত আমরা ছোট ছোট খাঁড়ি ঘুরে বেড়ালাম বাঘের খোঁজে। লস্করকাকু আলো নিয়ে খুঁজতে থাকলেন বাঘের পায়ের ছাপ। আর বলতে থাকলেন সেই দুষ্টু কুমীরটার গল্প। যে শুধু ওত পেতে থাকে কখন কার ছাগলটা, বাছুরটা তার নাগালে আসবে। সত্যি সেই রাতের কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না সিরাজুল।

রাতের নৌকা

অনেক রাতে একশো বছরের পুরনো রায়ডাক বন বাংলোয় এসে যখন পৌঁছোলাম তখন চারিদিকে পটকা ফাটার শব্দ...টিন পেটানোর আওয়াজ...। বুড়ো চৌকিদার এসে বললেন পাশের গ্রামে হাতি ঢুকেছে। আজ বোধহয় একটা ধানও থাকবে না। সারা রাত ধরে হাতি তাড়ালো গ্রামের মানুষ। সকালে ঘুম ভাঙলো একটা চেনা মিষ্টি গন্ধে। বারান্দায় এসে দেখলাম, সিঁড়ির কাছে ছোট্ট মাঠে ছড়িয়ে আছে শিউলি ফুল।

শিউলি ফুল

পশ্চিম চ্যাংমারী গ্রামে থাকে ঊষা নার্জিনারী। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা গ্রামে কোনো বিদ্যুত নেই। পাকা শৌচাগার নেই। ঠিকমতো রাস্তা নেই। সবার হাতে কাজ নেই। খুব চেনা লাগছে কি সিরাজুল? এই গ্রামটাও কিন্তু তোমার গ্রামের মতোই। তোমার গ্রামটা যেমন ঘিরে থাকে নদী, তোমার গ্রামে এখন যেমন নোনা জলে সব নষ্ট ঠিক তেমনই এখানে বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি নেই। বছরে একবার এখানে ধান হয়। তাও বৃষ্টির জলকে ভরসা করে। এই গ্রামটাকেও ঘিরে থাকে জঙ্গল, পাহাড়। আর ঘিরে থাকে ভয়। কখন হাতি আসে। তবুও ঊষা আর তার বন্ধুরা এখান থেকে বেশ কিছু দূরের স্কুলে গিয়ে পড়াশুনো করে। চেষ্টা করে এই প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার। তোমার চিঠিটা আমার সবটা পড়া হয়ে গেছে সিরাজুল। একবার নয় অনেকবার। ধান ক্ষেতের পাশে বসেই তোমাকে লিখছি। আর কোথা থেকে একটা নীলকন্ঠ পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে ছবির মতো গ্রামটার দিকে।

সবুজে ঘেরা গ্রাম

ঊষা এসে খবর দিলো নাচের দল রেডি। কেতকী, আশা, রেবা আজ আর কাউকেই চিনতে পারছি না। সবাই নিজেদের অর্থাত মেচ জনজাতির ট্রাডিশনাল পোষাকে সেজেগুজে এসেছে। শুরু হল 'বাগারুম্বা' (মানে নাচ)।

বাগারুম্বা

নাচ দেখে জঙ্গলের পথ ধরলাম আমরা। বিশ্বেশ্বর শৈব্য বললেন,"হাতিপোতায় আজ হাট বসেছে স্যার, দেখতে যাবেন?" লোভ সামলাতে পারলাম না সিরাজুল। প্রায় একঘন্টা হেঁটে হাতিপোতায় যখন পৌঁছোলাম তখন একটু একটু অন্ধকার হতে শুরু করেছে। রিঙ্কুর সাথে পরিচয় হল। রিঙ্কু হাটে বিক্রি করতে এসেছে কাঁচা সবজী। ক্লাস ফোরে পড়ে। বাড়ি ফিরে তেলের কুপি জ্বালিয়ে পড়তে বসবে। সামনেই পরীক্ষা তার।

রিঙ্কু

যে ছবিগুলো তোমাকে পাঠালাম, যাদের কথা তোমাকে বললাম সবাই তারা পিছিয়ে পড়া গ্রামে থাকে। হ্যাঁ ঠিক তোমার মতনই ওরা কষ্ট করে পড়ছে সিরাজুল। আর আমি কি ভাবছি জানো? একদিন তুমি, রিঙ্কু, ঊষা, মালতী যখন অনেক বড় হবে- বলতে শিখবে নিজের গ্রামের কথা, নদীর কথা, সমস্যার কথা। নিজেরাই এগিয়ে আসবে সামনের সারিতে...সেদিন সত্যি শরত তার অরুণ আলোর অঞ্জলীতে ভরিয়ে দেবে চারিদিক। সেদিন পবিত্র ঈদে সবাই পাবে প্রাণের জোয়ার...বাগুরাম্বায় থাকবে

মনের আনন্দ...আর ঠিক তখনই শুরু হবে সত্যিকারের উতসব। যে উতসবে আমরা মেতে উঠবো সবাই।

ভোরের আলো

মন দিয়ে পড়াশুনো কোরো। মা আর বাবাকে আমার প্রণাম জানিও। আশা করছি হেমন্তের কোনো এক সকালে আবার তোমার সাথে দেখা হবে সিরাজুল। তখন আবার আমরা ছোট্ট নৌকা নিয়ে বেড়িয়ে পড়বো খাঁড়িতে, কাঁকড়া ধরতে।

ভালো থেকো।

কল্লোল

শরতের কথা: অকাল বোধন

ভারি মুশকিলে পড়েছেন রাম। কি যে করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। দারুণ বিক্রমে যুদ্ধ করছে রাবণ। শেষে নিরুপায় হয়ে রাম ভীষণ এক চক্র ছুঁড়ে মারলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে রাবণের দশটা মুন্ডু কেটে গেলো। কিন্তু ও মা! মুন্ডুগুলো কাটতে না-কাটতেই আবার জুড়ে গেলো। এবার খুব শক্তিশালী অর্ধচন্দ্র বাণ ছুঁড়লেন। সেই একি ঘটনা। অনেক চিন্তা করে রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন বিভীষণ কে। বিভীষণের সঙ্গে পরামর্শ হলো। রাম বুঝতে পারলেন দেবী দুর্গাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে রাবণকে বধ করা যাবে না। তখন শরৎকাল। দুর্গাপুজো হয় বসন্তকালে। কিন্তু বসন্তকাল অবধি তো আর অপেক্ষা করা যায়না। শরৎকাল দেবদেবীদের নিদ্রাকাল। এ সময়ে তাঁরা ঘুমিয়ে কাটান। শেষ পর্যন্ত রামের অকাল বোধনে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দেখা দিলেন। রামায়ণের এই গল্পটা বোধ হয় তোমার জানা। কিন্তু একথাটা কি জানো যে এটা সত্যি সত্যি একটা গল্প। সংস্কৃত ভাষায় আসল যে রামায়ণ বাল্মিকী লিখেছিলেন, সেখানে এরকম কোন ঘটনার বর্ণণা নেই। রাবণ বধের জন্য রামের দেবী পুজোর কথাও সেখানে নেই। শরৎকালে দেবীর অকাল বোধনের এই গল্পটা জানা যায় মূলতঃ কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে। পনেরোশো শতাব্দীতে বাঙালী কবি কৃত্তিবাস ওঝাই প্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। তবে কৃত্তিবাস কিন্তু নিজে এ গল্প বানাননি। তাঁর রামায়ণের অনুবাদের প্রায় তিনশো বা চারশো বছর আগে থেকেই রাবণ কে বধ করবার জন্য রামের দুর্গাপুজোর কথা, অকালবোধনের কথা প্রচলিত ছিলো। কালিকা-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ প্রভৃতি উপপুরাণে শরৎকালে দুর্গাপুজোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই উপপুরাণগুলোতে আবার অকাল বোধন করেছিলেন রাম নয়, স্বয়ং ব্রহ্মা। কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে ব্রহ্মা রাত্রিবেলা দেবীর বোধন করেন, তাই এ বোধন অকাল বোধন। আসলে দেবতাদের দিন-রাত্রির হিসেবটা তো ঠিক আমাদের মতো নয়। একুশে জুন থেকে বাইশে ডিসেম্বর অর্থাৎ এই ছ'মাস সূর্যের যখন দক্ষিণায়ন হয়, সেই পুরো সময়টাই দেবতাদের কাছে এক রাত্রি। আর উত্তরায়ণের ছ'মাস হলো দেবতাদের একদিন বুঝতে পারছো তো কেনো একে অকাল বোধন বলা হয়?

কিন্তু সে যাই হোক, পন্ডিতেরা আবার মনে করেন যে এসব উপপুরাণগুলো সব পূর্বভারতেই লেখা হয়েছিলো। অর্থাৎ শরৎকালে দুর্গাপুজোর কথা পূর্বভারতেই প্রচলিত ছিলো। আসল রামায়ণে দুর্গাপুজোর কথা না থাকলেও পরবর্তীকালে এইসব গল্প-কাহিনী যুক্ত হয়েছে। আসলে রামায়ণকে তো শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিদেশেও বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তার ফলেই এক এক দেশে এক এক রকম রামায়ণের গল্প শোনা যায়। সংস্কৃত ভাষাতেই একটা রামায়ণ আছে, তার নাম "অদ্ভূত রামায়ণ"। তাতে কি বলা হয়েছে জানো? রাম নয়, রাবণকে নাকি মেরেছিলেন সীতা।

আমাদের বাংলাতে শরৎকালে যখন দুর্গাপুজো হয়, তখন সারা উত্তর ভারতে পালিত হয় নবরাত্রি আর দশেরা উৎসব। আরও মনে করে যে রাম রাবণকে আশ্বিন মাসের সশুক্লপক্ষের নবমীর দিন বধ করেছিলেন আর লঙ্কা জয় করে রাম দশমীর দিন অযোধ্যা যাত্রা করেন। কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি বাল্মিকীর রামায়ণে কোথাও শরৎকালের কথা নেই। আসলে শরৎকালটাও ঠিক যুদ্ধের সময় নয়।প্রাচীনকালে দেব-দানবের যে সব যুদ্ধ হয়েছিলো সেগুলিও শরৎকালে হয়নি। সে যুগে যুদ্ধের সময় ছিলো হেমন্ত ও বসন্তকাল। তখন তো আর বন্দুক কামান ছিলো না। তখন যুদ্ধের প্রধান অস্ত্রই ছিল তীর ধনুক। আর তীর ধনুকের যুদ্ধ অনেকটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। মনে করো, যদি বেশি জোর হাওয়া দেয় বা খুব বৃষ্টি হয় তাহলে তো তীর কে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা যাবেনা। লক্ষবস্তুতে আঘাত করাও সহজ হবেনা। আর আশ্বিন মাসে শ্রীলঙ্কায় ও দক্ষিণ ভারতে প্রকৃতি কিন্তু খুব শান্ত থাকে না। ঝড়বৃষ্টির উৎপাত মাঝে মধ্যেই দেখা দেয়। আচ্ছা ধরা যাক সেই সময় অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়ে প্রকৃতি শান্তই ছিলো। কিন্তু তা হলেও আশ্বিন মাসে যুদ্ধ করতে হলে রামকে সাগর পেরোতে হয়েছিলো কোন সময়ে? শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে। আর ওই মাসগুলোতে সমুদ্র থাকে উত্তাল।আর ওই উত্তাল সমুদ্রে সেই সময়ে সেতুবন্ধন করা প্রায় অসম্ভব। নল যতই দক্ষ স্থপতি হোন, আর সুগ্রীবের বানরসেনা যতই কর্মঠ হোক না কেনো, ঐ সময়ে সেতু বাঁধার ব্যাপারটা আমরা কি মানতে পারি?

আসল রামায়ণে যদিও কোথাও দুর্গাপুজোর কথা নেই। তবে মহাভারতে দুর্গাস্তবের খোঁজ পাওয়া যায়। বিরাটপর্বে আর ভীষ্মপর্বে। আরো এক আশ্চর্য কথা আছে মহাভারতের বনপর্বের ২২৯ অধ্যায়ে। সেখানে বলা হয়েছে দুর্গা নয়, মহিষাসুরকে বধ করেছেন কার্তিক।

সে যাই হোক প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দুর্গার পায়ের তলায় মহিষাসুরকেই আমরা দেখে থাকি। তাকে দুর্গা বধ করেছেন, তাই তিনি মহিষাসুরমর্দিনী। আর এই মোষের কথাতেই বলে রাখি আরো একজন দেবীর কথা। তিনিও দুর্গার মতোই যুদ্ধের দেবী। তার নাম ব্যাইরগো (Virgo)। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অধিবাসীরা মন্থমের জাতিকে জয় করেছিলেন। আর এই মন্থমের মানুষদের কাছে মোষ ছিলো খুব পবিত্র আর মূল্যবান পশু। তাই ব্যাইরগো দেবীও মোষ মেরেছিলেন বলে তিনিও মহিষমর্দিনী।

ফিরে আসি আবার সেই পুরোনো কথায়। আমরা কেনো শরৎকালে দুর্গাপুজো করি? আসলে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে - বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি চিরকালই কৃষির জন্য বিখ্যাত। কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলে ধান-ই হলো প্রধান ফসল। আমাদের বাংলাতেই এক কি দেড় হাজার বছর আগে এক ফসলের দেবী ছিলেন। তিনি কিন্তু বাঙালীর আসল দুর্গাদেবী। সে যুগে আউশ, আমন, বোরো এরকম বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম ধানের চাষ হতো না, শুধুমাত্র 'সাটি' বা 'সটি' ধানের চাষ হতো। বর্ষার শুরুতে এই ধান লাগানো হতো। বর্ষার জলে ষাট দিনের মধ্যেই এই ধান পেকে যেতো। শরৎকাল ছিলো ঐ ধানকাটার সময়, এখন আমরা এই ধানগুলোকেই 'কলমা' বা 'শালি' ধান বলি। জীবনানন্দ

দাশের রূপসী বাংলা কবিতায় তুমি 'রূপশালি' ধানের নাম পাবে, আর এই ধান কাটার পর যখন বাঙালীর গোলা ভরে যেতো তখনই বাঙালীরা উৎসবে মেতে উঠতো। এই ধান্যমাতা দেবীর পুজোই শারদীয়া পুজো। আর এই দেবীর-ই নাম শারদা।

গুজরাটেও শরৎকালে নতুন সূর্যের বন্দনা করা হয়। এই সময় সেখানকার মেয়েরা গর্বা নাচে মেতে ওঠে। বর্ষার শেষে শরৎকালকে নিয়ে উৎসবের এই রীতি বহু পুরোনো। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর ধরে মানুষ শরৎকালে শারদোৎসবের সঙ্গে দুর্গাপুজোকে মিলিয়ে দিয়ে যেমন দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে তেমনটি কেউ করেনি।

শুভ্রজিত চক্রবর্তী
বালী, হাওড়া

উজ্জ্বল অধ্যায়: পর্ব ১

রেবতীভূষণ ঘোষ

তিনি রেবতীভূষণ। যাঁর তুলির টানে হেসে ওঠে বাঘ, হাতি, সিংহ, হরিন। লাফিয়ে ছুটে হাঁফিয়ে ওঠে খরগোশ। বিগত সত্তর বছর ধরে ছোটদের বইকে রঙে রেখায় সাজিয়ে তুলেছে যাঁর তুলি। অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য এই শিষ্য কার্টুনের যে বিচিত্র জগৎ আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন তার যথাযথ মূল্যায়ণ আজও হয়নি। বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট শংকর উইকলিজের কর্ণধার শংকর পিল্লাই তাঁকে বলেছিলেন 'ওয়াল্ট ডিজ্‌নি অফ ইন্ডিয়া।' কলকাতা থেকে প্রায় একরকম জোর করেই নিয়ে গেছিলেন দিল্লিতে। তাঁর চিলড্রেন্‌স বুক্ ট্রাস্টের বইএর পাতা ছবিতে ছবিতে ভরিয়ে তোলার জন্য। তিনিই ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের প্রথম বাংলা কার্টুন ফিল্ম -'মিচকে পটাশ'-এর অ্যানিমেটর। ছবির পাশে পাশে ছড়া লেখাতেও ছিলো তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। শিশুদের জন্য তাঁর মন ভোলানো ছড়া-ছবি-গল্পের বিপুল সম্ভারে ভরে উঠবে আগামি সংখ্যাগুলো।

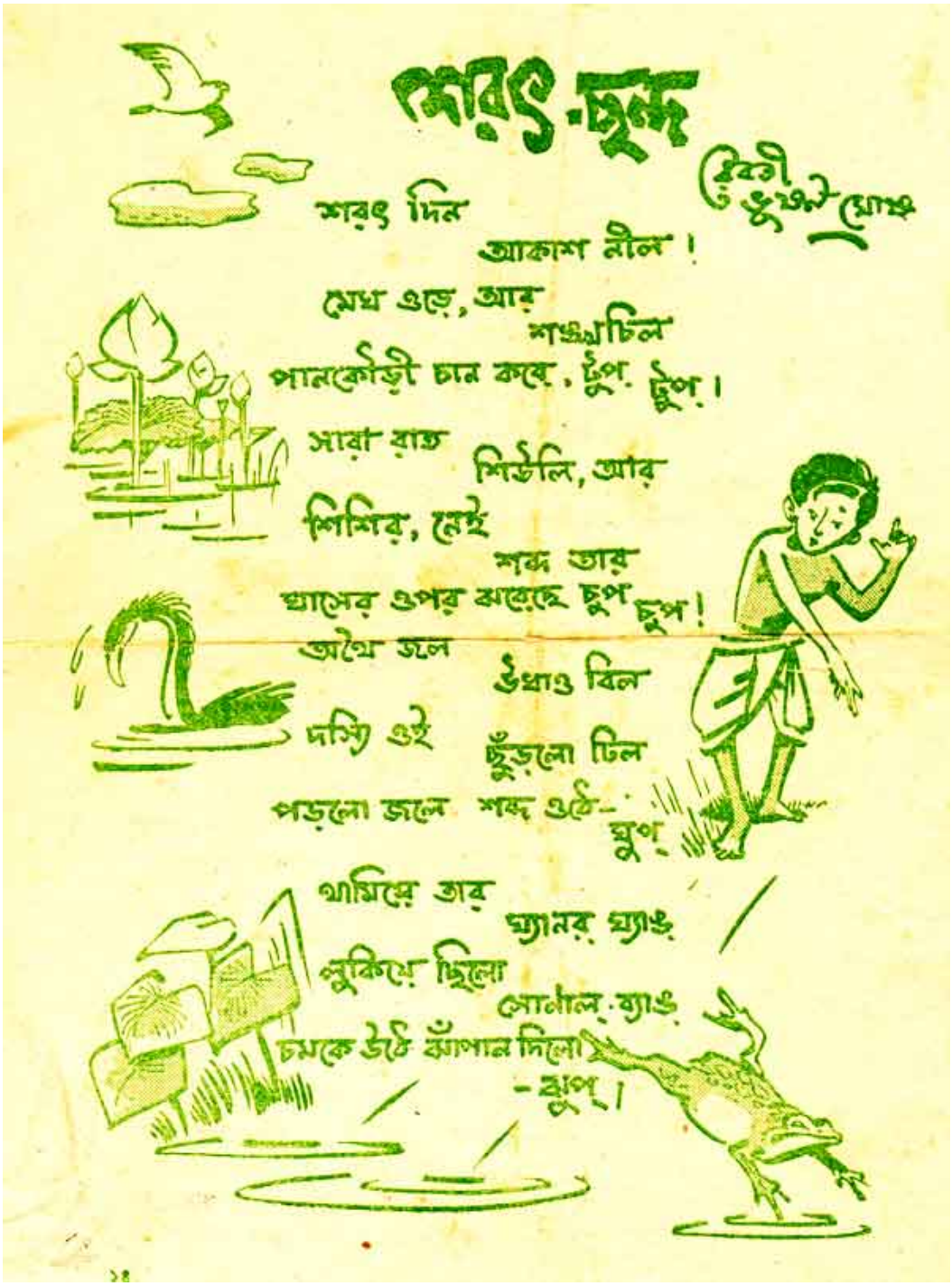

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
শুভ্রজিত চক্রবর্তী
ও
রেবতীভূষণের পরিবার

ছড়া-কবিতা

দুগ্‌গা ঠাকুর আসে

একখানা নীল, তিনখানা নীল, সাতখানা নীল এসে
বাড়ির ছাতের আকাশটাতে সাতসকালে মেশে।

হাট পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে একটা নতুন পাখী
কাঁসাই নদীর ঢেউগুলোকে করছে ডাকাডাকি।

ঢেউগুলো সব পালিয়ে বেড়ায় এই কাছে এই দূরে
তুলোর মত নরম এবং ফুরফুরে রোদ্দুরে।

বাজছে কোথাও গিজতা গিজাং পিঁপিঁড় পিঁপিঁড় বাঁশি
বাগান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শিউলি ফুলের হাসি।

ঘরপালানো মনটাকে আর যায় না ধরে রাখা
বইখাতা সব উধাও এখন, গানের সুরে আঁকা।

ঘিন্‌চিকুড়ি ঘিনচিকুড়ি দুগ্‌গা ঠাকুর আসে
জ্যোৎস্না পড়ে পদ্মপাতায়, শিশিরভেজা ঘাসে।

শ্যামলকান্তি দাশ
কলকাতা

চার বোন ভাই, ব্যস্ত সদাই

১

সরস্বতী বললে হেসেই,দ্যাখরে দিদি লক্ষ্মী
মর্ত্যের সব ছেলেমেয়েদের আমার পূজার ঝোঁক কী
লক্ষ্মী বলেন, আসল কারণ জানেও না কাক পক্ষী
'পাশ' করবার আশায় সবাই পোহায় এতই ঝক্কি!

২

মর্ত্যে এলেই লক্ষ্মী-সুরো ধরে আজব বায়না
যতই বোঝান দুর্গা,তবু মানতে ওরা চায় না!
চায়না ওরা শাড়ির পাহাড়, বা গয়নার বাহার
চপ-চাউ-ফ্রাই,রোল-মোগলাই লুকিয়ে করে আহার!

৩

সরস্বতী বললে, মাগো, বিগবাজারে যাবো
কার্তিক বললে,প্যান্টালুনেই আমার জিনিষ পাবো
গনেশ বলে,'বারমুডা' চাই, কোথায় পাবো কেতো?
লক্ষ্মী বলে,কিনবো 'টু-পার্ট',অ্যাড্রেসটা দে-তো!

৪

পূজোর ক'দিন চলল ওদের কেনাকাটার বহর
চার বোন-ভাই ব্যস্ত সদাই, ফেলল চষেই শহর!
এইসব ড্রেস-মেটেরিয়ালস স্বর্গে নিয়ে গিয়ে
নতুন ফ্যাশন করবে শুরু,সবযাবে চমকিয়ে।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
কলকাতা

পুজোর ছড়া

ড্যাম্ কুর্ কুর্ ড্যাম্ কুর্ কুর্ বাদ্যি ছিল ওই
সাদা কাশের ঢেউয়ের ওপর সাদা মেঘের ছই
কলা পাতায় ফলের কুচো কদমা চিঁড়ে দই
ছুটির ঘোরে পুরু ধুলোয় মুখ লুকোতো বই
চাকরে ছেলে কাজ পালিয়ে একবার আসতই
দশমীতে চোখের জলে মা হ'ত থই থই।

ড্যাম কুর কুর ড্যাম কুর কুর বাদ্যি বাজে কই
কাশ-শিউলি কবেই হাওয়া নকল ফুলই সই
বুক কাঁপানো মাইক যেন অসুরটা আস্তই
চোখ ঝলসা চমক শুধু ধূপের ভক্ত নই
যা ছিল আজ সব গিয়েছে থাক তবু হৈ চৈ
খুশির পুজোয় নখ বসানো রুখছি রুখবই।

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত
বালি,হাওড়া

ঝড়ের ছবি

ঝড় উঠেছে, আকাশ ছেয়ে
উড়ছে পাতা,
কাঁপছে বাতাস, উড়ছে আমার
আঁকার খাতা।
উড়তে উড়তে ছিঁড়লো ছবি
হাওয়ার টানে,
আকাশ জানে উড়তে থাকা
ছবির মানে।
ক্রেয়ন দিয়ে তৈরি বাড়ি,
মেঘ আকাশে-
জলের রঙে নৌকো পাড়ি
নিরুদ্দেশে,
বাউন্ডুলে ঝড়ের মঝে
সুযিমামা
মোমের চাদর সরিয়ে বলে
জলদি থামা।
জলরঙা ঘাস আকাশমুখো

চাতকজলে–
আঁকার খাতার ঝড়ের সঙ্গে
গল্প চলে।
চলতে চলতে গল্প নাচে
ঝড়ের তালে,
দুধসাদা বক আছড়ে পড়ে
ক্ষেতের আলে।
কামড়ে আছে খাতার পাতা
কালচে পাখি–
বলছে এমন আকাশ মেঘেই
আমরা থাকি,
ঝড়ের ছবি আঁকছে কবি
এমন ছলে
ভিজলো আমার আঁকার খাতা
মেঘের জলে।।

শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা

ফুল ছিঁড়ো না

ফুল ছিঁড়ো না অকারণে থাকনা ওরা গাছে
দেখছো নাকি ডগমগিয়ে হাওয়ায় কেমন নাচে।
প্রজাপতি আসছে ছুটে রঙীন পাখা মেলে
ওদের সাথে তাল মিলিয়ে ওরাও কেমন দোলে!
ফুলের উপর বসছে ওরা ফুলের সংখ্যা বাড়ে
ফুলগুলি সব খুশি হয়ে মিষ্টিসুবাস ছাড়ে।
ফুলের বাসে বিভোর হয়ে মৌমাছিরা ধায়
ফুলের বনে আপন মনে গুঞ্জরিয়া গায়।
ওদের মাঝে এই মিতালি যেন চিরকালই বাঁচে
ফুল ছিঁড়ো না অকারণে থাকনা ওরা গাছে।

জামাল ভড়
বারাসাত
উত্তর চব্বিশ পরগনা

ইচ্ছে মতন: সিংহের শিকার ধরা

আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে বন-জঙ্গল। সেইখানে থাকতো একটা সিংহ আর দুটো সিংহি। তারা একদিন হাতি, জেব্রা বা জিরাফ শিকার করতে গিয়েছিলো।

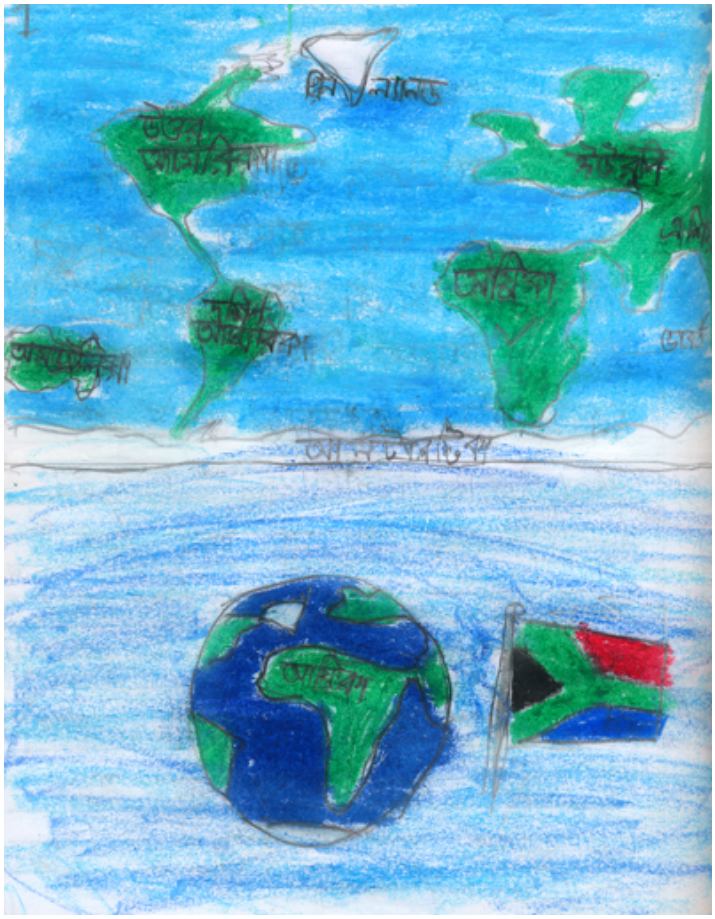

তারা একটা হাতি দেখলো, সেটা অনেক বড় ছিলো বলে ধরেনি।

তারা ঘুরে ঘুরে একটাও জিরাফ পেলো না। তাই ওরা একটু বিশ্রাম করে অন্যদিকে গেলো।

গিয়ে দেখলো একটা বড় মাঠ, সেখানে অনেক জেব্রা আর বাইসন ছিলো। ওরা সেগুলি শিকার করলো। রাত্রে ভালো ঘুম হলো।

ওরা আরো মাংস রেখেছিলো পরেরদিন খাবে বলে। সেই মাংসগুলো হায়নারা চুরি করে নিয়ে গেলো।

সকালবেলা উঠে ওরা ভাবলো এবার কি খাবে!

তারপর সিংহটা একটা বড় পাথর দেখতে পেলো।

সেটার ওপর উঠে সে জোরে গর্জন করতে লাগলো। সব পশুপাখিরা ভয়ে দৌড়াতে লাগলো। তাদের মধ্যে থেকে সিংহটা একটা হরিণ শিকার করলো।

ছবি ও লেখা
ঋক ঘোষ
৬ বছর
বি ডি মেমোরিয়াল স্কুল
কলকাতা

গল্প-স্বল্প

যে সয় সে রয়

এক

নিশ্চিন্ত রাজ্যের মহারাজ অচিন্ত্য সিংহ সিংহাসনে বসতে না বসতেই চারিদিকে ফিসফিস শব্দ শুরু হয়ে গেল। প্রজারা, সভাসদরা, মন্ত্রীরা এমনকী প্রধান সেনাপতি পর্যন্ত রাজার দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে আর এ ওর কানে, ও এর কানে কি যেন বলাবলি করে চলেছে। এরকম আগে কখনো ঘটেনি। রাজা খুব কৌতুহলী হয়ে পড়লেন। প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন

- 'সমস্যাটা কি? কী নিয়ে এতো গোপন আলোচনা চলছে?'

- 'পাকা চুল মহারাজ'।

- 'কার মাথায় পাকা চুল? তাকে এক্ষুনি সভায় এনে হাজির করো। আমি থাকতে আমার দেশের লোক দুঃশ্চিন্তা করবে এ তো মেনে নেওয়া যায় না।'

নিশ্চিন্ত রাজ্যে আবার কিছুতেই দুঃশ্চিন্তা লুকিয়ে রাখা যায় না। সামান্য কিছু একটা কারনে কেউ দুঃশ্চিন্তা করলেই তার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়। প্রধান মন্ত্রী একটু ইতস্তত করে বলল

- 'আপনার মাথায় পাকা চুল মহারাজ'।

- 'আমার মাথায়?' রাজা আকাশ থেকে পড়লেন। 'কই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।'

- 'রাজআয়না নিয়ে এলেই দেখতে পাবেন মহারাজ। লোক পাঠাবো আনতে?'

- 'আচ্ছা পাঠাও।'

রাজার বুকে দুরু দুরু কাঁপুনি শুরু হল। খবরটা উনি কাউকে জানাতে চাননি। কিন্তু এখন তো না জানিয়ে আর উপায় রইল না। মন্ত্রীর আদেশে ততক্ষনে দশ জন লোক মিলে বয়ে নিয়ে এসেছে রাজআয়না। সে এক দেখার মতো আয়না বটে। যেমন বিশাল তেমন অদ্ভূত কায়দায় তৈরী। সামনে দাঁড়িয়ে সোজা তাকালেই শরীরের সব দিক দেখা যায়। পায়ের পাতার নীচ থেকে মাথার তালু, হাতের নখ থেকে পায়ের গোড়ালি কিচ্ছু বাদ নেই।

সেই আয়নায় মাথার প্রতিটি চুল নিখুঁত করে পর্যবেক্ষন করলেন রাজা। পাকা চুলের সংখ্যা গুনতে গুনতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। দেখা গেল মাথায় মোট একানব্বইটা চুল পুরো পেকেছে, উনপঞ্চাশটা চুল অর্ধেক পাকা আর তেত্রিশটা চুলের গোড়ায় সবে একটু পাক ধরেছে। রাজা বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেন- 'হ্যাঁ বেশ অনেকগুলোই চুল পেকেছে বটে।' অর্থাৎ দুঃশ্চিন্তাটা বেশ বড় ধরনের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সভাসদরা সবাই মিলে রাজাকে চেপে ধরল

- 'মহারাজ, আমরা থাকতে আপনার এতো দুঃশ্চিন্তার কারনটা কী?'
রাজা আমতা আমতা করে শেষে বলেই ফেললেন

- 'রাজকন্যা নন্দিনী ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।'

সেনাপতি বললেন – 'সে কি!'

মন্ত্রী বললেন – 'সে কি!'

সব সভাসদরা এক সাথে বলে উঠলো – 'সে কি!'

'সে কি' 'সে কি' রবে গম গম করে উঠলো রাজসভা। সেনাপতি মাথা চুলকায়। মন্ত্রী মাথা চুলকায়। সভাসদরা সবাই জোরে জোরে মাথা চুলকে চলে। এমন কঠিন সমস্যায় সভাসদরা আগে কখনো পড়েন নি। রাজকন্যা সাঁতার কাটতে পারে, ঘোড়ায় চড়তে পারে, পাহাড়ে উঠতে পারে, শক্ত শক্ত অংক কষতে পারে, মোটা মোটা বই পড়তে পারে, কিন্তু ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না। এ ও কী সম্ভব? কিন্তু অনেক মাথা চুলকেও কেউ কোন উপায় ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে সবার মন দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল। প্রথমে প্রধান মন্ত্রীর মাথার চুলে কিছুটা পাক ধরল। তারপর সেনাপতির মাথার কয়েকগাছি চুল পেকে গেল। ক্রমশঃ সব সভাসদের চুল কিছুটা করে সাদা হয়ে গেল। দুঃসংবাদ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল দেশে। কিছুদিনের মধ্যে দেশবাসীর সবার মাথার এক গাছি করে চুল গেল পেকে।

দেশবাসীর সাদা কালো মাথাগুলোর দিকে তাকিয়ে রাজার মন আরো খারাপ হয়ে গেল। শেষে সারা রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল - রাজকন্যাকে যে ভাজা মাছ উলটে খাওয়া শেখাতে পারবে তাকে ভুরি ভুরি পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই খবর যথাসময়ে রাজকন্যা নন্দিনীর কানেও এসে পৌঁছল। কিন্তু সে স্বভাববশতঃ তাতে উতলা হওয়ার কোন কারন খুঁজে পেল না। তাই খবরটা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিলো।

দুই

একদিন দুপুরে রোজদিনকার মতোই রাজকন্যা মনের আনন্দে মধ্যাহ্ন ভোজ সারল। সোনার থালায় ভাত আর সঙ্গে সোনার বাটিতে সাজানো ছিল সাতাশ রকমের মাছ আর চৌষট্টি রকমের তরকারী। খাওয়া দাওয়া সেরে রাজকন্যা হেলতে দুলতে এসে তার নিজের শোওয়ার ঘরে ঢুকেছে। এখন সে সোনার পালঙ্কে লাল মখমলের বিছানায় শুয়ে মনের সুখে দিবাস্বপ্ন দেখবে। কিন্তু পালঙ্কে শুতে না শুতেই হঠাৎ অদ্ভূত এক শব্দ করে রাজবাড়ির সব ঘড়ি এক সঙ্গে থেমে গেল।

ঘড়িগুলোর কোন দোষ নেই। এমনিতে তারা খুব নিয়ম মেনে চলে। সারাদিন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁটাগুলো 'টিক' 'টিক' আওয়াজ করতে করতে ছুটে চলে। কিন্তু সময়টাই এমন খামখেয়ালি। সারা দিনরাত তার নদীর স্রোতের মতো একনাগাড়ে বয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে সে থমকে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেয়। ঘড়ির কাঁটাগুলোও তখন চলতে চলতে চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কারো কোন সময়ের হিসাব থাকে না তখন। তাই সবার সব কাজ থেকে ছুটি হয়ে যায়। এই সময়টাকে বলে পড়েপাওয়া সময়। সবাই তখন স্বাধীন। কারো ওপর কারো আদেশ চলে না, কোনো জোর খাটে না। সবাই নিজের ইচ্ছে খুশি মতো আনন্দে সময় কাটায়। তারপর আবার সময় যেই বইতে শুরু করে, ঘড়িও চলতে শুরু করে, সবাই যে যার রুটিনে ফিরে যায়।

অন্যদিন এইরকম পড়েপাওয়া সময়ে রাজকন্যা ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় বা বিড়ালদেরকে দাবা খেলা শেখায় বা গাছে উঠে আম-জাম পাড়ে বা পিঁপড়েদের জন্যে পাতার ঘর বানিয়ে দেয়। কিন্তু আজ সে সব কিছুই করতে ইচ্ছে করল না তার। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শুধু আকাশকুসুম ভেবে যাচ্ছে। কত রকমের ভাবনারা যে মাথায় ভীড় করে আসছে তার ঠিক নেই। সময়ের খামখেয়ালিপনার কথাই বেশী করে মনে হচ্ছে এখন। ছোটবেলা থেকেই শুনেছে যে এই পড়েপাওয়া সময়ে নাকি কোন সন্দেহ করা উচিত না। কিন্তু সন্দেহ করলে কী হতে পারে তা কেউ জানে না। অবশ্য লোকে বলে বলেই সব কথা যে সত্যি হবে এমনও তো নয়। হয়তো এসব শুধুই কথার কথা। যেমন সবাই বলে 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'। কিন্তু এ কথা কি আর সত্যি নাকি? একদিনও যদি রাজকন্যাকে এই নরম বিছানা ছেড়ে অন্য কোথাও ঘুমোতে বলা হয় তো রাজকন্যার কী আর ঘুম আসবে? জেগে জেগেই কাটিয়ে দিতে হবে সারারাত। অথবা একদিনও যদি সোনার থালায় ভাত আর সোনার বাটিতে করে নানারকম মাছ আর তরকারী না দেওয়া হয় তাহলে কী সে ভাত খেতে পারবে? কিছুতেই পারবে না। মুখেই রুচবে না। না খেয়েই থাকতে হবে।

যেই না ভাবা অমনি হঠাৎ রাজকন্যা দেখল হলুদ রং-এর আলোতে ঘর ভরে গেছে। আর সেই আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক পরী। সোনার মত তার গায়ের রঙ। আকাশের মতো নীল তার জামা। কালো মেঘের মতো তার চুল। হাতে তার জাদু লাঠি। লাঠিতে চাঁদ তারা ঝিকমিক করছে। এসেই বললো

- 'পড়েপাওয়া সময় আনন্দে না কাটিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছ। এখন যাও নিজের সন্দেহ নিজেই নিরসন কর।'

তিন

রাজকন্যা কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই উধাও হয়ে গেল পরী। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল অদ্ভূত কোন এক দেশে এসে পড়েছে সে। কোথাও কিছু নেই। মধ্য গগনে সূর্য। রোদের কী ভয়ানক তেজ আর গরম আঁচ। মাঠ ফুটি ফাটা হয়ে আছে। ধু ধু করছে চারিদিক। মাঝে একটা দুটো লম্বা লম্বা গাছ। তার ছায়াগুলো নীচে মাটিতে পৌঁছনোর আগেই যেন মিলিয়ে গেছে। একটু ছায়ায় বসে যে দু'দন্ড জিরিয়ে নেবে তাও সম্ভব নয়।

এমনিতে খুব সাহসী হলেও সামান্য একটু গা ছম ছম করল রাজকন্যার। এমন একা একা আগে তো কোথাও যায়নি। হঠাৎ-ই একেবারে নতুন একটা দেশে। কেউ কোথাও নেই। তারপরেই তার চোখ পড়ল নিজের বেঁটে খাটো ছায়াটার দিকে। কেমন যেন ওর পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বন্ধু বন্ধু হাবভাব। নিজেকে আর একা মনে হল না। এই তো ছায়াকন্যা সঙ্গে আছে তার। মনে জোর এলো। ভাবল দেখাই যাক না এই দেশটা কেমন। এই দেশেও নিশ্চয় একটা রাজা আছেন। তাঁকে গিয়ে যদি নিজের পরিচয় দেওয়া যায়, তাহলে তিনি নিশ্চয় রাজকন্যার বাড়ি ফিরে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করবেন। এখন শুধু রাজপ্রাসাদটা খুঁজে বার করতে পারলেই হল।

হাঁটতে আরম্ভ করল রাজকন্যা। আস্তে আস্তে প্রকৃতি বদলাতে থাকে। গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকে। রাজকন্যা হাঁটে আর পাশে পাশে ছায়াকন্যাও হাঁটে। দু বন্ধুতে হেঁটে চলে। ছায়াকন্যার সঙ্গে একা একাই অনেক গল্প করে রাজকন্যা। সূর্য পশ্চিম দিকে একটু একটু করে হেলে পড়ে। ছায়াকন্যাও লম্বায় একটু একটু করে বাড়তে থাকে।

হঠাৎ রাজকন্যা দেখে রাস্তার ধারে একটা ছোট কাঁটা গাছ লাল লাল ফলে ভরে আছে। ফল থেকে টুপটাপ রস গড়িয়ে পড়ছে। তার গায়ে বড় বড় হুলওয়ালা পোকাতে ছেয়ে গেছে। গাছটার ফল খেয়ে নষ্ট করে ফেলছে। গাছের গায়েও বড় বড় গর্ত করে ফেলেছে। গাছটা প্রায় মরে যায় যায় অবস্থা। ওর দেখে খুব মায়া হল। ও সব পোকা একটা একটা করে ধরে ধরে মেরে ফেলল। তারপর গাছটার

গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল – আমি সব পোকা মেরে দিয়েছি। আর তোমার কষ্ট হবে না। গাছটা বলল – তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। তাই আমার উপহার হিসেবে এই গাছের একটা ফুল নিয়ে যাও সঙ্গে। এই ফুলের ঘায়ে যে কেউ মূর্ছা যেতে পারে। আবার মূর্ছা যাওয়া লোকের জ্ঞানও ফিরে আসতে পারে। কিন্তু শুধু তোমার হাতে থাকলেই এই মূর্ছাফুল কাজ করবে।

রাজকন্যা গাছ থেকে একটা ছোট্ট সাদা ফুল তুলে নিয়ে সযত্নে তার জামার পকেটে রেখে দিল। তারপর গাছকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

কিছুদূর গিয়ে শোনে পাখিরা খুব কিচির মিচির করছে। কি হল কি হল। দেখে একটা বিশাল সাপ এক পাখির বাসায় ডিম খেতে উঠেছে। রাজকন্যা সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মূর্ছাফুল বার করে ঠেকিয়ে দিলো সাপের গায়ে। সাপটা চোখের নিমেষে অজ্ঞান হয়ে গাছ থেকে পড়ে গেল। তখন পাখিরা জ্ঞ্যানহীন সাপটাকে অনেক দূরের এক জঙ্গলে ফেলে এলো। ডিম বাঁচানোর জন্যে পাখিরা ওকে উপহার দিল একটা অপূর্ব সুন্দর পাখির পালক। একদিকে তার রামধনু রঙ আর অন্যদিকে আকাশের মতো নীল। বলল – এই মুশকিল আসান পালক সব সময় তোমার কাছে রেখ। তুমি যেমন আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করলে তেমন এই পালকও তোমায় সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

রাজকন্যা পালক নিয়ে, পাখিদের ধন্যবাদ দিয়ে আবার চলতে শুরু করে। বিকেল প্রায় শেষ হতে চলেছে। ছায়াকন্যা লম্বা হতে হতে এতটা লম্বা হয়ে গেছে যে তার মাথাটাই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এখন। অনেক দূরে দূরে কিছু ছোট বড় পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পায়ের নীচে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ। আবহাওয়া এখন অনেকটা মনোরম। কিন্তু রাজপ্রাসাদ তো দূরের কথা। কোন বাড়ি বা মানুষের কোন চিহ্নও নজরে পড়ছে না। রাজকন্যা আর বিশাল লম্বা ছায়াকন্যা হেঁটে চলেছে তো চলেছেই। তারপর একসময় টুপ করে সূর্য ডুবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল ছায়াকন্যা। রাজকন্যার তখন খুব একা লাগল। হাঁটতে একটুও ইচ্ছে করল না। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়ল মাটিতে ঘাসের ওপর।

চার

না জানি কতক্ষন ঘুমিয়ে রইল সে। যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখলো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। তারা ভরা আকাশ। আকাশে থালার মতো একটা বিশাল গোল চাঁদ। জ্যোৎস্নার মধ্যে মাঠের নরম ঘাসে শুয়ে থাকতে কী ভালোই না লাগছিল। রাজকন্যা অবাক হয়ে ভাবল যে সে রাজকন্যা হয়ে সোনার পালঙ্ক আর মখমলের বিছানা ছেড়ে এই মাটিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল? শরীরে তাহলে সত্যিই সব সয়ে যায়। একদম ঠিক কথা বলে লোকে। শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। শুধু যদি খিদে আর তেষ্টাটা না থাকত তাহলে আরো খানিকক্ষন আরামে ঘুমাতে পারত সে। একটু জল না খেলে শরীর আর বইছে না। কিন্তু এত রাত্রে কোথায় জল খুঁজবে। তেষ্টাতে গলাটা এত শুকিয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে এইবার বোধহয় মরেই যাবে।

ঠিক তখনই ওর পকেট থেকে সেই মুশকিল আসান পালকটা বেরিয়ে রামধনু রঙের আলোর অক্ষরে হাওয়াতে লিখে দিল – 'যে সয় সে রয়।'

বেশ কয়েকবার নিজের মনে কথাগুলো বলতেই কথাটার মানে বুঝতে পারল রাজকন্যা। পালক বলতে

চাইছে এখন সে কষ্ট সহ্য করতে পারলে তবেই প্রানে বেঁচে থাকবে। তাছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। শরীরকে বলল – 'শরীর মহাশয়, একটু কষ্ট সহ্য করো। চল, জলের সন্ধানে আবার হাঁটতে শুরু করি।'

শুরু করল হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখে ছোট্ট একটা বোতল তার পাশে পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। রাজকন্যা খুব অবাক হয়ে গেল। নিচু হয়ে বসে বোতলটা হাতে নিয়ে দেখল ভেতরে একটা ছায়া ছায়া মত কিছু। তার চোখ দুটো জোনাকীর মতো জ্বলছে আর নিভছে। চিঁ চিঁ করে কি সব কথাও বলছে সে। ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। কানের কাছে বোতলটা নিয়ে আসতেই শুনতে পেল তার কথা – দয়া করে, আমায় বোতল থেকে মুক্ত করে দাও। তুমি যা বলবে আমি তাই শুনবো।

– কিন্তু তুমি কে? বোতলের ভেতর তোমায় কে ঢোকালো?

– আমি সব বলব। তুমি আগে আমায় বার করো।

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি বোতলের ছিপিটা খুলে দিলো। ছায়ামূর্তি বোতল থেকে বেরিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল

– তিন দিন ধরে আমি বোতল বন্দী হয়ে আছি। বোতলের মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে বসে থাকতে থাকতে আমার গায়েহাতে ব্যাথা হয়ে গেছে। ভাগ্যিস তোমার দেখা পেলাম। তুমি যে আমার কতো উপকার করলে তা বলার নয়। এখন থেকে তুমি যা বলবে আমি তাই শুনবো।

– তুমি কে? তোমার নাম কি?

– আমার নাম ফিসফিস। আমি একটা মেছোভূত। আগে ছিলাম মাছধরা জেলে। মছলী দ্বীপে থাকতাম। এক দুষ্টু ডাইনী আমাদের দ্বীপটা দখল করে নিয়ে আমাদের সবাইকে মন্ত্রবলে মেছোভূত বানিয়ে দিয়েছে।

– এখন তাহলে থাকো কোথায়?

– সেই ডাইনী আমাদের একটা রাজপ্রাসাদে থাকতে দিয়েছে।

– কিন্তু তোমায় বোতলে ঢোকালো কে?

– আমাদের সর্দার নিশপিশ। আমি কাজে ফাঁকি দিয়ে একটু জ্যোৎস্নাতে ভিজছিলাম। তাতে রেগে আগুন তেলে বেগুন হয়ে আমাকে বোতল-বন্দী করে ছুঁড়ে একেবারে রাজ্যের বাইরে বার করে দিলো।

বলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল ফিসফিস।

রাজকন্যা আবার এই কান্না ব্যাপারটা একেবারে সহ্য করতে পারে না। বলল

– কেঁদো না। তুমি আমার সব কথা শুনে চললে আমি নিশপিশকে সরিয়ে তোমায় দলের সর্দার করে দেব। কিন্তু আগে আমায় তোমাদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে চল। তেষ্টায় প্রান গেল আমার।

ফিসফিস ওকে কাঁধে চাপিয়ে চোখের নিমেষে চলে এল রাজপ্রাসাদে। শ্বেত পাথরের বিশাল প্রাসাদ।

চাঁদের আলোয় চকচক করছে। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর। সামনে বিশাল গেট। কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। শুকনো পাতা পড়ে বিশ্রী নোংরা হয়ে আছে। সামনে একটা জলে ভরা বিশাল সরোবর। সেখানে পেট ভরে জল খেয়ে রাজকন্যা শরীরে প্রান ফিরে এল। তারপর ফিসফিসকে বলল

- চলো রাজপ্রাসাদের ভেতরে যাই। খিদেতে পেট চুঁইচুঁই করছে। জলদি আমায় কিছু খেতে দাও।

শুনেই খুব ভয় পেয়ে গেল ফিসফিস - আমি যাব না ভেতরে। আমায় দেখতে পেলে সর্দার খুব রেগে যাবে। বরং তুমি একটা মাছ খাও।

চোখের নিমেষে সরোবর থেকে একটা মাছ ধরে এনে দিল। কিন্তু রাজকন্যা কাঁচামাছ দেখেই আঁতকে উঠলো – ইস, এমন কাঁচা মাছ কী করে খাব?

- আমরা তো রোজ এই খাই।

- আমি কী তোমার মত মেছোভূত নাকি?

তখন ফিসফিস রাজপ্রাসাদের কলাবাগান থেকেই অনেকগুলো কলা পেড়ে এনে দিল। রাজকন্যার কলা খেতে একেবারেই ভাল লাগে না। কলা আবার খাবার মত একটা ফল হল। কিন্তু এত খিদে পেয়েছিল কী আর করে। শরীরকে বলল – 'ওহে শরীর মহাশয়, সওয়াতে যখন হবেই তখন একটু সয়ে নিন। আর কোন খাবার জুটছে না এখন। কলা-ই খান পেটভরে।' বলেই সব কটা কলা গপাগপ খেয়ে নিল। খেতে খেতে ভাবল কলাটা আসলে অতটা খারাপ খাবার নয় যতটা সে আগে ভাবত।

পাঁচ

ফল খেয়ে জল খেয়ে রাজকন্যার পেট ভরল, মন শান্ত হল। তারপর সরোবরের ধারে মেছোভূত আর রাজকন্যা গল্প করতে বসল।

রাজকন্যা বলল - এই রাজ্যের নাম কি?

- আগে ছিল আনন্দ রাজ্য। আমরা এসে রাজ্যের নাম পালটে করে দিয়েছি ভূতানন্দ রাজ্য।

- আচ্ছা। কিন্তু সেই আনন্দ রাজ্যের রাজা, রানি লোকজন সব কোথায় গেল।

- ডাইনীর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। তাই ডাইনী সবাইকে মন্ত্রবলে গাছ করে দিয়েছে। এখানে যত গাছপালা দেখছ তার অনেকেই আগে এই রাজ্যের লোক ছিল। শুধু রাজপুত্রকে ডাইনীটা মেরে ফেলেনি।

ঐ যে চিলেকোঠার ঘর দেখছ ওখানেই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে রাজপুত্রকে। ডাইনী রোজ নিজে এসে দেখে যায়।

বলে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো ঘরটা। রাজকন্যা দেখল হাল্কা নীল একটা আলো জ্বলছে। এতক্ষন খেয়াল হয়নি। রাজপ্রাসাদে রাজা রানী না থাক কিন্তু একটা রাজপুত্র আছে শুনেই রাজকন্যার মনে খুব আনন্দ হল। কিন্তু এই ডাইনীটা খুব গোলমেলে।

- ডাইনী রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে রাখলেন কেন?

- তার যে রাজপুত্রকে খুব পছন্দ। সামনের পূর্নিমাতে রাজপুত্রকে বিয়ে করবে বলেছে।

- আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারবে রাজপুত্রের ঘরে।

- না, আমি কিছুতেই রাজপ্রাসাদে যাবো না। সর্দার দেখতে পেলে আমাকে জল-শাস্তি দেবে।

- জল-শাস্তিটা আবার কি?

- বোতলে পুরে জলে ফেলে দেবে। তখন কোন মাছ এসে আমায় গপ করে খেয়ে নেবে। আর আমি কোনদিন মুক্তি পাব না।

বলেই আবার কাঁদতে লাগল ফিসফিস। তার কান্না দেখে রাজকন্যার মাথাটা বেজায় গরম হয়ে গেল।

- কথায় কথায় কাঁদো কেন? আমি রাজকন্যা হয়ে নিজের দেশ ছেড়ে এমন একটা ভূতের দেশে বসে আছি। কই তাতেও তো আমি কাঁদছি না। শীগ্রি কান্না থামাও। না হলে আমিই তোমায় বোতলে পুরে জলে ফেলে দেব।

তাও মেছো ভূত কান্না থামায় না দেখে রাজকন্যা আর রাগ সামলাতে পারলো না। মূর্ছাফুল বার করে ফিসফিসের গায়ে ঠেকিয়ে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন তাকে বোতলের ভেতর পুরে ছিপি আটকে দিল। তারপর বোতলটাকে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিতে যাবে, এমন সময় মুশকিল আসান পালক রাজকন্যার পকেট থেকে বেরিয়ে এসে হাওয়ায় রামধনু রঙের আলো দিয়ে লিখে দিলো – 'ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ।'

তখন রাজকন্যার হুঁশ ফিরলো। মনে মনে ভাবল – ক্রোধ মানে এই রাগ ব্যাপারটা সত্যি-ই খুব খারাপ জিনিষ। নাঃ, এতোটা রাগ করা তার একেবারেই উচিত হয়নি। ফিসফিস তো আর মানুষ নয়। একটু না হয় কান্নাকাটি করলই। কিন্তু এখন ও-ই তো রাজকন্যার একমাত্র বন্ধু। একমাত্র কথা বলার সঙ্গী। তা ছাড়া ঐ-ই তো ওর প্রান বাঁচালো। না হলে জল তেষ্টায় ও মরেই যেত আজ। বোতল বন্দী ফিসফিসকে পকেটে পুরে রাখল। পরে যখন দরকার হবে তখন জ্ঞান ফেরালেই চলবে।

রাজপুত্রের কাছে যাওয়ার জন্যে রাজপ্রাসাদের গেট দিয়ে ঢুকতে গেল রাজকন্যা। দেখল ভীষন হৈ চৈ চলছে ভেতরে। রাজপ্রাসাদ ভরা অসংখ্য ভূত। কারো মূলোর মতো সাদা সাদা দাঁত, কারো কুলোর মতো চওড়া চওড়া কান, কারো লুচির মতো ফুলো ফুলো গাল, কারো চুলের মতো সরু সুরু হাত। নানা ভূত নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ মাছ খাচ্ছে, কেউ মাছ কাটছে, কেউ মাছ দিয়ে খেলছে। একদিকে অনেক মাছ জড়ো করা। মেছোবাজার বসে গেছে যেন। তারমধ্যে গোটা কুড়ি ভূত রাজপ্রাসাদের

চিলেকোঠায় চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে আর আর নাকী সুরে গান গেয়ে চলেছে।

চাঁদ উঁঠেছে ফুঁল ফুঁটেছে চিঁলেকোঠায় কেঁ
ভূঁত নাঁচছে, প্রেঁত নাঁচছে রাঁজপুত্রের বেঁ।

বুঝতে পারল মেছোভূতেদের কাজ কর্ম ফূর্তি আহ্লাদ সব শেষ হওয়ার আগে কিছুতেই এই ভূতপুরীতে ঢোকা যাবে না। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ছয়

ভূতেদের মাছকান্ড দেখতে দেখতে কখন ঝোপের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজকন্যা। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। ফুর ফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। কোথাও কোন ভূত নজরে পড়ল না। কোথাও অন্যরকম আওয়াজ পর্যন্ত নেই। রাজপ্রাসাদের সব ঘর ঘুরে ঘুরে দেখল। শুন শান। কেউ কোথাও নেই। শুধু রাশি রাশি সরষে ছড়িয়ে পেড়ে আছে রাজপ্রাসাদময়। তাহলে কী স্বপ্ন দেখেছিল নাকি? কিন্তু এতো স্পষ্ট মনে আছে ভূতগুলোকে। ভূতগুলো নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। এমনও হতে পারে, সারা রাত জেগে এখন ঘুমাচ্ছে। তখনই ফিসফিসের কথা মনে পড়ল। বোতলটা পকেট থেকে বার করে দেখল। আরে কোথায় ফিসফিস? কিচ্ছু নেই বোতলের ভেতর। মনটা খচখচ করতে থাকল।

অমনি মুশকিল আসান পালক পকেট থেকে বেরিয়ে লিখে দিল – 'সরষের মধ্যে ভূত।'

সরষের মধ্যে ভূত? অবাক কান্ড। তাই জন্যেই রাজপ্রাসাদময় এতো সরষে ছড়ানো? বোতলটা পরীক্ষা করে দেখল যে বোতলের তলাতেও একটা সরষে দানা পড়ে আছে বটে। তাহলে ঠিকই ফিসফিস বোতলবন্দী হয়ে আছে। দিনের বেলা বলে কি ভূতেরা সরষে হয়ে গেছে? নাকি সেই ডাইনীটা মন্ত্র বলে এরকম করে দিয়েছে ওদের। আহা বেচারা ফিসফিস। জেলে থেকে মেছোভূত হয়েছিল, আবার মেছোভূত থেকে সরষে হয়ে গেল। এখন দরকার পড়লেও ফিসফিসের জ্ঞান ফেরানো যাবে না, কোন কাজেও লাগানো যাবে না ওকে। একটাই মাত্র বন্ধু ছিল সঙ্গে তাকেও হারালো। তবে মুশকিল আসান পালক তো সঙ্গে আছে। সে যে খুব ভালো আর উপকারী বন্ধু তা বুঝতে আর বাকী নেই রাজকন্যার।

রাজকন্যা মন খারাপ না করে সোজা গেল চিলেকোঠায় রাজপুত্রের ঘরে। সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজপুত্র ঘুমাচ্ছে। যেমন সুন্দর তার চেহারা তেমন সুন্দর তার পোষাক পরিচ্ছদ। রাজপুত্রকে দেখেই ভালোবেসে ফেলল রাজকন্যা। ভাবল বিয়ে যদি করতে হয় তো এই রাজপুত্রকেই বিয়ে করবে সে। কিন্তু তার আগে ডাইনী বুড়িটার একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে হবে না। অনেক ঠেলাঠেলি, ডাকাডাকি করেও রাজপুত্রের ঘুম ভাঙ্গাতে পারল না। তখনই মনে পড়ল মূর্ছাফুলের কথা। ফুলটা পকেট থেকে বার করে রাজপুত্রের গায়ে ঠেকাতেই রাজপুত্র চোখ মেলে উঠে বসল।

রাজকন্যাকে দেখে তো রাজপুত্র খুব অবাক হয়ে গেছে। এমন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে সে আগে কোনদিন দেখেনি। ভাবল ডাইনী বুঝি রূপ বদল করে এসেছে। কিন্তু দিনের বেলা ডাইনী তো কোনদিন আসে না। রাজকন্যা তার অবস্থা বুঝতে পেরে নিজের পরিচয় দিলো। বলল তার রাজ্যের কথা। কি ভাবে

এখানে এসেছে সব জানালো তাকে। রাজপুত্র তখন খুব খুশী হয়ে ওকেও নিজের সব কথা বলল। বলল তার নাম অনন্ত কুমার। বলল কেমন ভীষন যুদ্ধ হয়েছিল ডাইনীর সঙ্গে। এখনও রোজ রাত্রে সুন্দরী মেয়ে সেজে সেই ডাইনী আসে। গল্প করে রাজপুত্রের সঙ্গে। খেতে দেয়। তারপর মন্ত্র বলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। বলেছে সামনের পূর্নিমার দিন রাজপুত্রকে বিয়ে করবে। তাই রাজপুত্র খুব চিন্তায় আছে। বলল - চলো এক্ষুনি আমরা দুজনে পালিয়ে যাই অনেক দূরের কোন দেশে। তাহলে ডাইনী আমাদের আর ধরতে পারবে না।

রাজকন্যা বলল - আমরা পালিয়ে গেলে তোমাকে হয়তো বাঁচানো যাবে। কিন্তু তোমার মা, বাবা রাজ্যের লোকজন যাদের ডাইনী মন্ত্রবলে গাছ করে দিয়েছে তারা কেউ মুক্তি পাবে না। তার থেকে বরং আমরা চেষ্টা করে দেখি কি করে ডাইনীটাকে মেরে ফেলা যায়। এখনো বেশ কিছুদিন সময় আছে। যদি পূর্নিমার আগে ডাইনীটা না মরে তাহলে আমরা এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব।

রাজপুত্র রাজী হয়। তারপর দুজনে আলোচনা করে কী করে ঐ ডাইনীকে মেরে ফেলা যায়। রাজপুত্র জানায় ডাইনী খুব শক্তিশালী। তারওপর অনেক মন্ত্র জানে। ওর দলে অনেক ভূত, রাক্ষস, খোক্কস আছে। যেভাবে ও এই রাজ্যকে দখল করেছে তাতে ওকে গায়ের জোরে যুদ্ধ করে হারানো যাবে না। তখনই মুশকিল আসান পালক লিখে দিল – 'বুদ্ধি যার বল তার।'

আর সেটা দেখেই রাজপুত্রের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল - ডাইনী যখন গল্প করবে তখন কথায় কথায় যতটা পারি তার গোপন খবর জেনে নেব। কোথায় তার দেশ? সে অমর কিনা? যদি না হয় তাহলে কী করে মারা যায় ডাইনী কে? তার দূর্বলতা কী? সব কিছু।

- তাহলে খুব ভালো হবে। তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে। আজ রাত্রেই চেষ্টা করো জানতে। আমিও এই খাটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকব। একবার কাছ থেকে ডাইনীকে দেখতে চাই। যদি কিছু জানা যায়।

রাজপুত্রের সঙ্গে অনেক গল্প করে তাকে মূর্ছাফুল দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে রাজকন্যা চলে এলো নীচে। খুব খিদে পেয়েছিল তার। সারা রাজপ্রাসাদ ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজলো। কিন্তু কিছুই পেলনা। যা ছিল সব ভূতেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছে বোধহয়। একটা ঘরে দেখল মোহর ভরা রাজকোষে খোলা পড়ে রয়েছে। কিন্তু মোহরে তার কী কাজ। তারপর এলো রান্নাঘরে। সেখানে দেখল বেশ কয়েকটা মাছ রাখা আছে। ভূতেরা নিশ্চয় এত মাছ খেয়ে শেষ করতে পারেনি। কড়ায় অনেকটা তেল ঢেলে সে মাছ ভাজতে বসল। কিন্তু আগে তো সে কোন দিন রান্না করেনি। তাই মাছ ভাজাতে গিয়ে খুব মুশকিলে পড়ল। অনেকক্ষন মাছ ভাজার পরেও মাছের রঙ ভাজা ভাজা হল না।

নিজের মনেই বলল - মাছ ঠিক ভাজা হচ্ছে না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে পালকটা ওর পকেট থেকে বেরিয়ে আলোর অক্ষরে লিখে দিলো

- 'উলটে দেখো পালটে গেছে।'

উল্টানো কাকে বলে সেটাই তো জানে না রাজকন্যা। তাই জিজ্ঞাসা করে - উল্টোবো কি করে?

তখন পালক নিজে উলটে একবার নীল থেকে রামধনু রঙ হল, আবার রামধনু থেকে নীল। তক্ষুনি

ব্যাপারটা জলের মতো পরিস্কার বুঝতে পারল রাজকন্যা।

- ও এই সামান্য ব্যাপার।

হাসি মুখে খুন্তি দিয়ে মাছের নীচের পিঠটা উপরে করে মাছটা উলটে দিলো। আর দিতেই দেখে সত্যিই তো পালটে গেছে। এখন বেশ মাছটা ভাজা ভাজা হয়েছে মনে হচ্ছে। খুশি মনে বেশ অনেকগুলো মাছ ভেজে থালায় নিয়ে খেতে বসল রাজকন্যা। আগের স্বভাব মতো মাছের একদিকটা খেয়েই সরিয়ে রাখছিল থালায়।

কিন্তু মুশকিল আসান পালক আজ ওকে ছাড়বে না। লিখে দিলো – 'উলটে দেখো পালটে গেছে।'

রাজকন্যা সঙ্গে সঙ্গে মাছটা উলটে দিল। দেখল আরে সত্যি-ই তো পালটে গেছে। উলটোদিকটা দেখে মনে হচ্ছে মাছটা পুরোটাই গোটা আছে। সে ভাল করে উলটো দিকটাও খেয়ে নিল। তখনই মনে পড়ল মহারাজার কথা। সে ভাজা মাছ উলটে খেতে পারে না বলে কতো দুঃশ্চিন্তা ছিল। যখন এই খবর জানতে পারবে তখন কত খুশিই না হবেন। যাইহোক এখন সেসব ভেবে লাভ নেই। খাওয়া সেরে হাত মুখ ধুয়ে রাজকন্যা রাজপ্রাসাদের পালঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত

নানা রকম কথাবার্তার আওয়াজে হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আর ঘরের মধ্যে গোটা পঞ্চাশ ভূত বকবক করছে। ওকে বিছানায় উঠে বসতে দেখেই একজন বলল

- তুমি কে? এখানে কি করে এলে?

আর একজন বলছে - এটা ভূতের দেশ জানো না। এখানে কোন মানুষের ঢোকা বারন। ডাইনী জানতে পারলে তোমার রক্ত চুষে খেয়ে নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে।

আর একজন পেছন থেকে বলে উঠলো

- একে এখানে আটকে রাখ। আমি এক্ষুনি গিয়ে সর্দারকে খবর দিচ্ছি।

তখন রাজকন্যা বলল – তোমরা আগে মাছধরা জেলে ছিলে তো? ডাইনী তোমাদের এরকম ভূত করে রেখেছে। আমি এসেছি তোমাদের মুক্তি দিতে। তোমরা যদি আমার কথা মত কদিন কাজ করো তাহলে আমি এই ডাইনীকে মেরে ফেলে তোমাদের মুক্তি দেব।

সবাই মুক্তি পাওয়ার কথায় আনন্দে নেচে উঠলো। কিন্তু ততক্ষনে সর্দার আরো কিছু ভূতকে নিয়ে এসে হাজির। এসেই আদেশ দিল - ওকে বেঁধে রাখো দড়ি দিয়ে। ডাইনী এলেই ওকে নিয়ে যাবে তার কাছে। যা ব্যবস্থা করার ডাইনীই করবে।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক ভূত এসে ওকে আক্রমন করল চারিদিক থেকে। রাজকন্যা কী করবে ভাবতে না ভাবতে সেই মুশকিল আসান পালক শুরু করে দিল ওর খেলা। সব ভূতের গায়ে এমন সুড়সুড়ি দিতে

আরম্ভ করল যে সবাই কাতুকুতুর চোটে অস্থির। হাসছে, কাঁদছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে। পালক তাও থামছে না। শেষে সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, সবাই রাজকন্যার পক্ষে। সবাই রাজকন্যাকে সাহায্য করবে।

এপাশে সবাই রাজকন্যার পক্ষে চলে যাওয়ার সর্দার গেল খেপে। বলল

– ঠিক আছে। রাজকন্যাকে বাঁধার জন্যে আমি একাই একশ।

বলে যেই না কাছে এগিয়ে এসে সর্দার রাজকন্যার হাতটা ধরেছে অমনি রাজকন্যা তার গায়ে মূর্ছাফুল ঠেকিয়ে দিল। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে সর্দার নিশপিশ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাজকন্যা তখন বোতল থেকে ফিসফিসকে বার করে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়ে সবাই কে বলল

– আজ থেকে ফিসফিস তোমাদের নতুন সর্দার। সবাই ওর কথা শুনে চলবে।

ফিসফিসের তো আনন্দের আর সীমা নেই। 'ধিন তা না না' করে নাচতে শুরু করে দিল। আর সেই বোতলের মধ্যে নিশপিশকে পুরে রাজকন্যা বোতলটা তুলে দিল নতুন ভূতের সর্দার ফিসফিসের হাতে।

– দেখি তোমার হাতের জোর কেমন। কত দূরে তুমি একে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো।

ফিসফিস গায়ের জোরে কে-জানে-কোন-রাজ্যে ছুঁড়ে ফেল দিল বোতলটা।

আট

রাজকন্যা ভূতেদের সঙ্গে একটা জরুরী মিটিং সেরে নিল। রাজকন্যা ও ফিসফিসের সব কথা শুনে চলবে বলে কথা দিল সব ভূত। তারপর রাজকন্যা চিলেকোঠার ঘরে রাজপুত্রের খাটের তলায় লুকিয়ে বসে অপেক্ষা করতে থাকল ডাইনী বুড়ির জন্যে।

রাত একটু বাড়তেই হঠাৎ বিকট আওয়াজ করে কেউ যেন উড়ে এসে নামল। ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠলো রাজপ্রাসাদটা। রাজকন্যা দেখল এক ভয়ানক দেখতে ডাইনী জানলা দিয়ে ঢুকে এলো ভেতরে। এসে একটা বিশ্রী কালো রঙের আলখাল্লা খুলে বাইরে রাখল। তারপর রূপ বদলে করে হয়ে গেল এক পরমাসুন্দরী মেয়ে। সে রাজপুত্রের ঘুম ভাঙ্গালো। রাজপুত্রের সঙ্গে অনেক গল্প করল। খেতেও দিলো। ভালো ভালো খাবারের গন্ধে জিভে জল চলে এলো রাজকন্যার। সেই রাজপ্রাসাদ থেকে চলে আসার পর থেকে তার এই সব খাওয়া জোটেনি। জীবনটাই পালটে গেছে এখন। শরীর মহাশয়-এর ঢের শিক্ষা হয়েছে।

গল্প করতে করতে রাজপুত্র একসময় বলল – তুমি রোজ আসো আর রোজ চলে যাও। তোমার সঙ্গে ভালো করে গল্প করা হয়না কোনদিন। আজ তুমি এখানেই থাকো।

ডাইনী বলল – থাকতে কি আর আমারই ইচ্ছে করে না? কিন্তু অনেক কাজ। এই তো আর মাত্র কদিন। সামনের পূর্নিমাতেই তো আমরা বিয়ে করব। তারপরে তোমাকে নিয়ে চলে যাব আমার রাজ্যে। তখন অনেক গল্প হবে।

রাজপুত্র ভেতরে ভেতরে একটু ভয়ে কেঁপে উঠলো। কিন্তু প্রকাশ করল না। বলল

- এত কাজের লোক থাকতে তোমার আবার এত কাজ কী শুনি?

- খুব বড় দায়িত্ব আমার উপর। সে তুমি বুঝবে না।

- বুঝবো না কেমন? বলে দেখ দিকি। আর কদিন পরে তোমাকে বিয়ে করলে তো আমাকেই তোমার সব দায়িত্ব নিতে হবে। না বুঝলে চলবে কেন?

- তা ঠিকই বলেছ। তোমাকে বলাই যায়। আসলে একটা কই মাছের প্রান রক্ষার দায়িত্ব আছে আমার ওপর। তাকে সারাদিন পাহারা দিতে হয়।

- একটা সামান্য কই মাছ তুমি সারাদিন পাহারা দাও? সে দেশে তো তোমার কত চাকর বাকর দাস দাসী। কাউকে একটা পাহারায় বসিয়ে রাখলেই তো পারো।

- না, আর কাউকে আমার বিশ্বাস হয় না। এ তো আর যে সে কই মাছ নয়। এই কই মাছের পেটের মধ্যে এক সোনার কৌটে আমার প্রানভ্রমর রাখা আছে।

- তাহলে তো খুব জরুরী ব্যাপার। কিন্তু তুমি যে রোজ রাত্রে এখানে আসো তখন যদি কেউ সেই মাছ ধরে নেয় তাহলে কী হবে। তুমি মরে গেলে আমার তো আর কেউ থাকবে না।

- দূর! মাছ ধরা কি এত সহজ নাকি। এত গভীর রাত্রে সাতটা সমুদ্র পেরিয়ে কে যাবে সেখানে?

তারপর তিন তিনটে দূর্গম পাহাড় টপকে তবে সেই সরোবরে পৌঁছতে হবে। সরোবরে তাকে ধরাও কি আর সোজা কথা। সরোবরের জল যেমন কালো, কই মাছের রঙ ও তেমন কালো মিশমিশে।

- যাক শুনে নিশ্চিন্ত লাগছে। এতো কান্ড করে কই মাছ ধরা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

- একেবারেই চিন্তা কোরো না। তাছাড়া সেই কই মাছের পেট থেকে কৌট বার করলেও তো আমার প্রানভ্রমরের নাগাল পাবে না। সেই বাক্স খুলতে চাই এক সোনার চাবি। সে চাবি সবসময় আমার কাছে আমার আলখাল্লার পকেটে থাকে।

- এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ তুমি।

তারপর ডাইনী অনেক গল্প করে রাজপুত্রকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর সেই বিচ্ছিরি কালো আলখাল্লা গায়ে দিয়ে ডাইনী রূপ ধারন করে উড়ে চলে গেল চিলেকোঠার জানলা দিয়ে।

নয়

পরদিন সন্ধ্যেবেলা রাজকন্যা সব কথা জানল ভূতেদের। ঠিক হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ডাইনী বুড়ির দেশে যেতে হবে। ভূতেরা বলল তাদের কয়েকজনকে যদি রাজকন্যা সঙ্গে নিয়ে যায় তাহলেই তারা ঠিক কই মাছ ধরে ফেলতে পারবে। সেই কথামত গোটা পঁচিশ সাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ভূত বেছে নিল রাজকন্যা। ফিসফিসকে বলল

- তুমি এখানেই থাকবে। রাজপ্রাসাদের সবকিছু দেখা শোনার ভার তোমার ওপর। ডাইনী এসে যেন বুঝতে না পারে যে ভূতের সংখ্যা কমে গেছে। আর একটা খুব দায়িত্বপূর্ন কাজও তোমাকে করতে হবে। পরদিন রাত্রে যখন ডাইনী এসে তার আলখাল্লাটা খুলে রাজপুত্রের ঘরে ঢুকবে তখন তার আলখাল্লার পকেট থেকে সোনার চাবিটা বার করে নিয়ে সেখানে একটা লোহার চাবি ঢুকিয়ে দিতে হবে। খুব সাবধানে। খবরদার ডাইনী যেন টের না পায়।

ফিসফিস বলল – সে আমি সব করে দেবো। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল কি ভাবে যাবে অতদূর দেশে? সাতটা সমুদ্র আর তিনটে পাহাড় পেরোনো তো সহজ কথা নয়। এ দেশে পক্ষীরাজ ঘোড়াও নেই যে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

- কেন? মেছোভূতেরা পারবে না উড়িয়ে নিয়ে যেতে?

- কিছুদূর পারবে। কিন্তু ভূতেরা একটানা বেশি দূর যেতে পারে না। অত দূরে যেতে যেতে রাত শেষ হয়ে গেলেই তো আবার সব ভূতেরা সরষে হয়ে যাবে। তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

- খুব মুশকিলের ব্যাপার হল।

আর তখনই মুশকিল আসান পালক বেরিয়ে এলো তার পকেট থেকে। তার গা থেকে রামধনু রঙের অদ্ভূত এক আলো বেরোতে শুরু করল। আর দেখতে না দেখতে সে একটা ভীষন সুন্দর রামধনু রঙের পাখিতে পরিনত হল। বলল

- আমি পক্ষীরানি মায়া। আমার পিঠে চেপে বসো। আমি পৌঁছে দেবো সেই ডাইনী রাজ্যে।

রাজকন্যার তো খুশির শেষ নেই। চেপে বসল পক্ষীরানির পিঠে। সব ভূতরাও চেপে বসল। নীল সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল, নানা অচেনা দেশের ওপর দিয়ে রামধনুর মতো ওরা ভেসে যেতে থাকল। ভাসতে ভাসতে ঠিক রাত শেষ হওয়ার একটু আগে পৌঁছে গেল ডাইনীর দেশে। তখনও সেখানে সবাই ঘুমিয়ে। ওরা সেই পাহাড়ে ঘেরা কালো সরোবরের পাশে এক গুহায় গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকল। দিন হতে না হতেই ভূতেরা হয়ে গেল সরষে আর পক্ষীরানিও ফিরে এলো তার পালক মূর্তিতে।

আবার সন্ধ্যে হতেই ভূতেরা ফিরে পেল নিজেদের শরীর। ডাইনী যেই উড়ে গেল আনন্দ রাজ্যের রাজপুত্রের কাছে অমনি ভূতেরা নেমে পড়ল সরোবরের কালো জলে কই মাছ ধরতে। বেশীক্ষন লাগল না তারা কই মাছ ধরে এনে দিল রাজকন্যার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে কই মাছকে ফুলের ঘায়ে অজ্ঞান করে দিল রাজকন্যা। তারপর পক্ষীরানির পিঠে চেপে ফিরে চলল রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদ থেকে একটু দূরে একটা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে নামল তারা। যাতে ডাইনীর কোন সন্দেহ না হয়। তারপর পালক নিয়ে ভূতের পিঠে চেপে রাজকন্যা পৌঁছে গেল রাজপ্রাসাদে। চুপিচুপি ঢুকলো রান্নাঘরে।

ডাইনী তখনও রাজপুত্রের ঘরেই গল্প করছে। ফিসফিসকে ডেকে পাঠালো রাজকন্যা। ফিসফিস আগে থেকেই সোনার চাবি উদ্ধার করে রেখেছিল। রাজকন্যা একটুও সময় নষ্ট করল না। কই মাছের পেট বঁটি দিয়ে এক কোপে কেটে বার করল সোনার বাক্স। সেটা সোনার চাবি দিয়ে খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল ডাইনীর প্রানভ্রমর। বিশ্রী কালো রং-এর ভোমরাকে বঁটি দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলল রাজকন্যা।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র দেখলো তার সামনে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটি এক ভয়ানক দেখতে ডাইনীতে

পরিনত হয়ে যাচ্ছে। তার গোটা গা যন্ত্রনায় কালো হয়ে যাচ্ছে। আর ভয়ংকর আর্তনাদ করতে করতে সেই ডাইনী চিলেকোঠার জানলা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেলো আকাশে। আর দেখতে না দেখতে সব ভূত আর রাজকন্যাদের চোখের সামনেই ডাইনীর বিশ্রী বিশাল শরীরটা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

সবাই রাজকন্যার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

দশ

সবাই ডাইনীর শরীরটাকে ঘিরে দাঁড়ালো। রাজকন্যা শুনতে পেল একটা মিষ্টি বাজনা বাজছে কোথাও। চোখে পড়ল ডাইনীর গলায় একটা সোনার হারে একটা ছোট লকেট ঝুলছে। বুঝতে পারল সেই লকেটেই জলতরঙ্গের মত মিঠে বাজনাটা বাজছে। রাজকন্যা তাড়াতাড় গিয়ে লকেটটা খুলে নেয়। তার একটা ছোট্ট বোতাম টিপতেই সেটা বাক্সের মতো খুলে যায়। আর তার ভেতরে জ্বলে ওঠে একটা সবুজ আলো। সেই আলো বাক্স থেকে বেরিয়ে সারা রাজপ্রাসাদ আলোয় ভরিয়ে তোলে। নিমেষের মধ্যে মেছোভূতেরা সবাই আবার মাছধরা জেলে হয়ে যায়।

সেই আলো তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা রাজ্য জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আওয়াজে ভরে যায় গোটা রাজ্য। রাজপ্রাসাদ ভরে ওঠে রাজা রানি মন্ত্রী সেনাপতি সভাসদ আর সব হারিয়ে যাওয়া মানুষে। রাজ্য ভরে ওঠে জনগনে। রাজপ্রাসাদ আবার ঝকঝকে চকচকে হয়ে যায়। ঝাড়বাতিতে আর সব বাতিদানে আলো জ্বলে ওঠে। ফোয়ারাগুলো চালু হয়ে যায়। হাতি শালে হাতি ঘোড়া শালে ঘোড়া ভরে যায়। সরোবরে টলটলে জল। সেখানে পদ্ম ফুটে ওঠে। রাজহাঁসেরা চরে বেড়ায়। আনন্দ আর ধরে না রাজপুরীতে। রাজপুত্র, রাজা আর রানী সবাই একে অপরকে দেখে খুশিতে আনন্দে ভেসে যায়। সবাই এসে রাজকন্যাকে তাদের প্রান রক্ষার জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানায়। ফিসফিস সহ সব মাছধরা জেলেদের তাদের সাহসিকতার জন্যে পুরস্কৃত করা হয়।

আনন্দ রাজ্যের রাজা দূত মারফত নিশ্চিন্ত রাজ্যে খবর পাঠান। মহারাজ অচিন্ত্য সিংহ রাজকন্যা নন্দিনীর খবর পেয়ে খুব খুশী হন। রাজকন্যা ভাজা মাছ উলটে খেতে শিখে গেছে এবং একটা রাজ্যের সবাইকে উদ্ধার করেছে শুনে তাঁর আহ্লাদে আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যময়। আর রাজ্যের সব লোকের মাথার চুল আবার আগের মতো কালো হয়ে যায়।

দুই রাজ্যে শুরু হয়ে যায় আনন্দ উৎসব। মহা ধুমধাম করে রাজকন্যা আর রাজপুত্রের বিয়ে হয়। রাজপুত্র অনন্ত কুমার আর রাজকন্যা নন্দিনী সুখে শান্তিতে ও আনন্দে বসবাস করতে থাকে।

~সমাপ্ত~

রুচিরা
বেইজিং, চীন

ঝালং

আমি ঝালং। খুব সুন্দর একটা পাহাড়ি জায়গার নামে আমার মা রেখেছিল আমার নাম। ঝালংয়ে আমি অবশ্য কখনও যাই নি। মা হয়তো নিয়ে যেতো কোনও দিন-কিন্তু আমি যখন ক্লাস ওয়ান, আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল মা। আমার মা বলতো ভালো মানুষ মরে গেলে স্বর্গে যায়, দুষ্টু লোক নরকে। মা খুব ভালো ছিল, তাই মা স্বর্গে গেছে আমি জানি। বাবা বলে যে মরা মানুষের ছবি বাড়িতে রাখতে নেই, তাই মায়ের কোনও ফটো নেই আমাদের বাড়িতে।

আমি এখন এইটে পড়ি। সাদা আর আর আকাশী ইউনিফর্ম আমাদের স্কুলের। সামনের বার আমার শাড়ি হবে। স্কুলে যেতে আমার একটুও ভালো লাগে না। পেটে ব্যাথা, মাথায় ব্যাথা-এইসব বলে টলে আমি প্রায়ই বাড়িতে শুয়ে থাকি। স্কুলে যাই না। কী করবো বলো,বইয়ের পাতায় আমার কিছুতেই মন বসে না। প্রতিবার এনুয়াল পরীক্ষা বিচ্ছিরি রকম দিয়ে এসে চুপ করে বসে থাকি। তখন ঠাকুরকে ডাকি খুব করে। ঠাকুর কিন্তু ভালো, বাবার মতো রাগী নয়। আমার কথা শোনে-তাই হয়তো টেনেটুনে পাশ করে যাই প্রত্যেকবার। পাশ না করলে যে বাবা আমায় খুব বকবে! বাবা হাসিখুশি মানুষ, সহজে রাগে না। তবে যদি কখনও বাবা রেগে যায় আমার খুব ভয় করে। তখন আমার পিঠে পড়ে দু-চার ঘা।

মা যে বছর স্বর্গে চলে গেল তার পরের বছর এ বাড়িতে এসেছিল ভাল-মা। আর তার পরের বছর রিশপ হল। রিশপ ভারী মিষ্টি দেখতে। ফর্সা, কোঁকড়া চুল, স্বপ্নের মতো চোখ দুটো। পাহাড়ি জায়গার নামে আমার নাম ঝালং, তার সঙ্গে মিলিয়ে ভাল-মা ভাইয়ের নাম দিয়েছে রিশপ। রঙীন ছবির বইতে যেমন থাকে, রিশপ জায়গাটাও তেমন-খুব সুন্দর।

রিশপ ছোট, ও এখন টু-তে পড়ে। গেলবার ওর জন্মদিনে বাবা আর ভাল-মা ওকে নিয়ে গিয়েছিল রিশপে। তিনদিনের জন্য। তখন পাশের শুক্লা কাকিমার কোয়ার্টারে ছিলাম আমি। ওরা ফিরে আসার পর রিশপ জায়গাটার গল্প শুনেছি ভাইয়ের কাছে। ও তো ছোট, ভালো করে বলতে পারে না। তবে বুঝেছি যে রিশপ জায়গাটা সত্যি সত্যি দারুণ।

ভাই, বাবা আর ভাল-মায়ের সাথে শোয়। ওর কিন্তু লেখা পড়ায় খুব মন। ও একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ভাল-মা সেদিন শুক্লা কাকিমার কাছে গল্প করছিল-খুব খরচ সেই স্কুলে। ঝকঝকে ইউনিফর্ম ওদের স্কুলের। ভাইয়ের এখন মেরুন হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্ট। আর মেরুন টাই। বুকে আবার সুতো দিয়ে কাজ করা একটা প্রদীপের শিখা। তার নিচে স্কুলের নাম লেখা। ভাই যখন টাই পড়ে তখন ধবধবে ভাইটাকে মনে হয় যেন একেবারে যেন বিলেতের কোন সাহেবের বাড়ির বাচ্চা। এবার ওয়ান থেকে টুয়ে ওঠবার সময় ভাই থার্ড হয়েছিল। বাবা তাই ভাইকে খুব আদর করে। ভাল-মাও তো ভাইকে খুব ভালো বাসে। চুপচুপ করে ভাইকে ফ্রিজ খুলে এটা সেটা খাওয়ায়। মাছের ভালো টুকরোটা রাখা থাকে ভাইয়ের জন্য। আমিও ভাইকে খুব ভালোবাসি। স্কুলের টিফিনের পয়সা জমিয়ে ওর জন্য একটা ক্রিকেট খেলার ব্যাট নিয়ে এসেছিলাম গতবার ওর জন্মদিনে। বাবা পিঠ চাপড়ে বলেছিল, সাবাস মেয়ে। আমার খুব আনন্দ হয়েছিল।

আমাদের বাবা রেলে চাকরি করে তো, তাই আমরা রেল কোয়ার্টারে থাকি। আমাদের রেল কোয়ার্টারে এসেছ কখনও? ওমা, আসোনি? ওই তো স্টেশনের পাশে দেখ লাল রঙের একতলা ছোট্ট ছবির মতো বাড়িটাই তো আমাদের। ওই যে গো, যে বাড়িটার সামনের ফুল বাগানে গুচ্ছের গাঁদা ফুল ফুটে আছে। মরশুমি গোলাপও ফুটেছে কত দেখ। বিরাট একটা গুলমোহর গাছও রয়েছে, পাহারা দিচ্ছে আমাদের কোয়ার্টারটাকে। ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে তো, লাল রঙের ফুল ফুটেছে, লাল হয়ে রয়েছে গাছটা। আরও দু-তিনটে গাছ দেখ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুলমোহর গাছটার পাশে। দাঁড়াও, চৈত্র মাস আসতে দাও, দেখবে ওগুলোর দুষ্টুমি। ঝড়ে ওরা পাগলের মতো নাচানাচি করতে থাকবে তখন। ওই দেখ গুলমোহরের পাশে ওটা কী গাছ বল তো? ঠি বলেছ, ওটা বাঁদড় লাঠি গাছ। আর তার পাশে দেখ হলদে ফুলের রাধা চূড়া। কি মিষ্টি দেখতে না! আর ওই যে একদম কোণার দিকটা তাকাও ওটা জারুল গাছ। যখন বেগুনি রঙের ফুল ফুটবে ওর ডালে ডালে তখন তোমার চোখ একেবারে জুড়িয়ে দেবে ও।

বাড়ির সামনের স্টেশনটায় সারাদিনে খুব বেশি ট্রেন যায় না। যখন ট্রেন আসে, আমি গুমগুম শব্দ

শুনি, আমি ছুট্টে চলে যাই স্টেশনটায়। প্লাটর্ফম দিয়ে হাঁটি। জটলা হয়ে থাকে জানলা গুলোর সামনেটায়। সবাই যাচ্ছে এখানে-ওখানে আমার বয়েসি কত ছেলে মেয়েও তো আছে ওদের দলে। তাদের ছাড়তে এসেছে বাড়ির লোক। সবাই চিতকার করছে নিজের নিজের বাড়ির মানুষের জন্য। সাবধানে যাস সোনাই...পৌঁছে ফোন করিস...অচেনা লোকের কাছ থেকে কিছু খাস না...হটপটটার মধ্যে মাংস আছে...আর ফয়েলে হাতে গড়া রুটি...গরম গরম খেয়ে নিস...বেশি রাত করিস না...তিন্নি দার্জিলিংয়ে এখন খুব শীত, সন্ধ্যের পর আর বাইরে বেরোবার দরকার নেই ঠান্ডা লেগে যাবে...তোমার টনসিলের দোষ আছে রাজ, পাহাড়ে গিয়ে আইসক্রিম একদম খাবে না বলে দিলাম...আর হ্যাঁ,ক্যামেরাটা সাবধানে রেখো, দামি জিনিস ভেঙে ফেলো না যেন...বনি জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে চেপে যখন যাবে জঙ্গলে ঘুরতে,তখন গন্ডার দেখতে পাবেই, ফোটো তুলে রাখতে ভুলো না...চাপড়ামারির বাংলোটা খুব ভাল, এখন খুব ভাল ওয়েদার পাবে, ওখানকার কুকটার হাতের যা রান্না না দুর্দান্ত...বুঝলি তিতির পূর্ণিমার রাতে ওয়াচটাওয়ারে বসে রুপোলি রঙের মূর্তি নদী আর তার পাশের ছমছমে কালচে সবুজ গরুমারা জঙ্গল দেখবি যখন তখন বুঝবি কাকে বলে সৌন্দর্য...।

বাবা এখানকার স্টেশনবাবু। ছোট্ট স্টেশনের অফিস ঘরে বসে। ঘরটা আমাদের জন্মের আগে একবার চুনকাম করা হয়েছিল, তারপর আর বোধহয় রং হয়নি। দিনের বেলাতেই ঘরটা কেমন অন্ধকার ম্যাটম্যাটে। বাবার মাথার পেছনে বিরাট সাইজের একটা ঘড়ি। ওপরে ঘটাং ঘটাং করে একটা ফ্যান চলে সারাদিন। মাকড়সার জালে আর ঝুলে ফ্যানটা কালচে হয়ে গেছে। কেউ পরিষ্কার করার নেই। কখনও কখনও আমায় স্টেশনে ঘুরে বেড়াতে দেখে অবাক হয়ে বাবা বলে, ঝালং তুই ফাঁক পেলেই স্টেশনে চলে আসিস কেন রে? তোর পড়াশুনো নেই! খবরের কাগজে যে দেয় দেখিস না-দিনকাল খুব খারাপ কিন্তু এখন। কোন দিন তোকে ছেলে ধরা তুলে নিয়ে চলে যাবে-তারপর পাচার করে দেবে অন্য রাজ্যে, তখন মজাটা টের পাবি। ভিক্ষে করে খেতে হবে তারপর। ভাল-মা বিরক্ত হয়ে বলে এমন উড়ন চন্ডী মেয়ে জন্মে দেখিনি বাবা! লেখা নেই পড়া নেই সারাদিন শুধু টোটো কোম্পানি! আমি লজ্জা পাই। চুপ করে থাকি।

আমি যে কেনো স্টেশনে আসি, ঘুরে ঘুরে বেড়াই ট্রেনের পাশ দিয়ে-সেটা অবশ্য কাউকে বলা যাবে না। এমনকি বাবাকেও না। ট্রেনে করে যারা ঘুরতে যায় সেই ছেলে মেয়েগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে একছুট্টে চলে যাই দার্জিলিংয়ের ম্যালে পেস্তা দেওয়া আইসক্রীম খেতে খেতে তাকিয়ে থাকি পশ্চিম দিকের পাহাড়ের আড়লে কমলা রঙের বিরাট উলের বলটার দিকে। তিতির, তিন্নি, সোনাই, রাজ, বনিদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেড়াতে চলে যাই কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁওয়ের পাহাড়ে। কখনও হারিয়ে যাই জলদাপাড়ার সবুজ শাল, সেগুন, মাদার,ডুমুর, অর্জুন,লালি আর দুধে-লালির ভিড়ে। হাতির দল নুন খতে আসে যে রাস্তা দিয়ে সেই চাপড়ামারির গা ছমছম পথে ঘুরে বেড়াই ক্যামেরা হাতে। তারপর গরুমারার গহীন বনের মধ্যে শিরশিরিয়ে বয়ে যাওয়া মূর্তি নদীর ঠান্ডা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে থাকি আমি, রাজ, বনি, তিন্নি, সোনাই আর তিতির।

মাঝে মাঝে কোথায় যাই জানো, ঝালংয়ে। কি সবুজ যে সেই জায়গাটা না দেখলে বুঝতে পারবে না। নদীর ধারে একটা জায়গা আছে খুব সুন্দর। কতরকম পাখি যে ডাকে, আর কি অদ্ভুত তাদের ডাক যে আমরা কান পেতে শুনি,তাদের কিচিরমিচির। রোদের তেজ থাকে না বেশি, তবুও ছোট্ট একটা ছবির মতো পাহাড় দাঁড়িয়ে থেকে ছায়া দেয় আমাদের। বন্ধুরা যখন খেলতে থাকে, তখন আমায় দেখে মেঘের কাপড় সরিয়ে আকাশ থেকে নেমে আসে মা। আরে না ভাল-মা নয়, আমার নিজের মা।

একমাত্র এই ঝালংয়ে এলেই দেখা হয় মায়ের সঙ্গে। ফিনফিনে জরির মতো পাহাড়ি নদীটার পাশে আমরা বসে থাকি চুপচাপ। মা একটা জাফরানি রঙের সিল্কের শাড়ি পরে থাকে বেশিরভাগ দিন। মায়ের চোখে ছায়া পড়ে ঝালং পাহাড়ের। মায়ের গায়ের করবীফুলের গন্ধটা স্পষ্ট নাকে আসে আমার। কেউ কোন কথা বলি না আমরা মা-মেয়েতে। দু'জনে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকি দু'জনের দিকে। তাছাড়া কথা বলার দরকার কী, চোখ যখন কথা বলে তখন কি আর শব্দের দরকার হয়, বলো!

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
জলপাইগুড়ি

তিতলি আর মিনি

তিতলির খুব মনখারাপ। আজ নিয়ে তিনদিন হল, মিনির সঙ্গে দেখা হয় নি।

মাম অফিস যাবার আগে রোজ ডাইনিং টেবিলের ওপর দুধ-ভাত রেখে যায়, যেমনকার তেমন পড়ে থাকে .. মিনি আসে না। হয়ত মিনির আর দুধভাত খেতে ইচ্ছে করে না। তাই রোজ এসে না খেয়ে ফিরে যায়। স্কুলে গিয়েও মন বসে না তিতলির। স্কুলবাসে যাবার সময় জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজে রোজ, কোথথাও নেই মিনি।

কোথায় বিপদে পড়ল মিনি!

রাতে ঘুমোতে যাবার আগে বাবা রোজ গল্প বলে। বাবা যে কি ভালো ভালো গল্প বলতে পারে! জন্তু-জানোয়ার, ভুতপ্রেত, সুন্দরী রাজকন্যা, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি, দত্যিদানো, অসমসাহসিক সব অভিযান, ক্যাসাবিয়াঙ্কা, সিন্ডারেলা .. বাবা গল্প শুরু করলে তিতলির আর কোনোদিকে মন থাকে না। কাল বারবার গল্প থামিয়ে মিনির কথা জিজ্ঞেস করেছে তিতলি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই এক্কেবারে প্রথম যার কথা মনে হয়েছে, সে মিনি।

কি যে হল মিনির! কোথায় গেল!

রাস্তায় বেরোলেই তো কত গাড়ি। তাছাড়া বুবলিদের ব্লকটা পেরোলেই সারি সারি গ্যারেজ .. সেখানে ক'দিন ধরে তিন-চারটে রাস্তার কুকুর এসে আছে। মাম বলে,'খবরদার ওদিকে যাবি না তিতলি। কুকুর কামড়ালেই ইঞ্জেকশন নিতে হবে কিন্তু।'

মিনির তো মা নেই। কে বলে দেবে ওকে? তা হলে কি রাস্তার কুকুরগুলোই মিনিকে!

না না, ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল তিতলি। মিনির খুব বুদ্ধি। ওকে কুকুরগুলো ধরতেই পারবে না। তা হলে কি মিনির শরীর খারাপ হল! আজ কাল রোজ এবাড়ি সেবাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছে মিনি।

সেভেন-বির আন্টি বলছিলেন মাকে, 'কি যে বাজে স্বভাব হয়েছে মিনির, একটা জিনিস রাখার উপায় নেই।'

ইলেভেন-সির আন্টিও বলছিলেন, মিনি নাকি ওঁদের সব মাছগুলো খেয়ে নিয়েছে।

ঋষির মা গরম দুধ নামিয়ে ঋষিকে স্কুলবাসে তুলতে গেছেন, এসে দেখেন মিনি সেই গরম দুধে মুখ দিয়েছে। খেতেও পারে নি, ছ্যাঁকা লেগে পালিয়েছে, দুধ ছত্রাকার। এক ডেকচি দুধ ফেলে দিতে হল। মাম বলছিল বাবাকে,'মিনিটা তো এমন ছিল না। খাবার সময় যা দেওয়া হত, তাই খেত সোনামুখ করে। তারপর একটা নিরিবিলি গরম জায়গা দেখে শুয়ে থাকত। এদিকে বাড়িতে রোজ দুধ-ভাত পড়ে থাকছে, আর লোকের বাড়ি বাড়ি চুরি করে খাচ্ছে। এমন তো ছিল না মিনি।'

বাবা বলল, 'স্বভাব যাবে কোথায়!'

বাবা যা-ই বলুক, তিতলিও দেখেছে মিনি কক্ষনো চুরি করে খেত না। এমনকি নেংটি ইঁদুর ধরেও খায় নি কোনোদিন। সামনে পেলেও ইঁদুরদের তাড়া করত না। তিতলি নিজে দেখেছে।
সেই সেবারের ঝড়ে সামনের বড়ো গাছ থেকে পাখির বাসা পড়ে গেছিল নিচে, তবু মিনি পাখির বাচ্চাগুলোকে ধরে নি। বরং নিজেই সারারাত একটা সরু ডালে বসে ভয়ে খিদেয় মিউমিউ করে ডেকেছিল। সকাল বেলায় দুধ দিতে এসে রামরতনচাচা দেখতে পেয়ে নামিয়ে আনল, তবে দুধ খেল মিনি।

এমন লক্ষী মিনি বাড়ি বাড়ি ঢুকে সব খেয়ে নিচ্ছে!

যেমন সুন্দর দেখতে, তেমন মিষ্টি স্বভাব মিনির। সাদা খয়েরি ডোরা-কাটা গা, লাল লাল পুঁতির মতো চোখ, এই মোটা ল্যাজ। সারাদিন নিজের গা চেটে চেটে পরিষ্কার করে। খিদে পেলে মিউমিউ করে মায়ের পায়ে পায়ে ঘোরে। রোজ সকালে মামের সঙ্গে চা বিস্কুট খায়। চায়ে ভিজিয়ে নরম বিস্কুট খাইয়েছে তিতলিও।

মাম সেন্টার টেবিলে চায়ের কাপ রাখলেই মিনি এসে পড়বে। অমনি বাবা বলবে,'ওই এলেন তিনি! চায়ের নেশা হয়েছে দ্যাখো!'

ঠাম্মা বলত,'দুধ মাছ রুটি সব খাচ্ছে, আবার চা! মুখের কাছে খাবার পেলে কে আর কষ্ট করে ইঁদুর ধরবে বল্?'

ঠাম্মা এসেছিল যখন, মিনি একদিনও সোফায় উঠে ঘুমোতে যায় নি। কি বুদ্ধি! জানে, ঠাম্মা রাগ করবে। কিন্তু মিনি তো চুরি করে খায় নি কোনোদিন। সবাই এত চুরির বদনাম দিচ্ছে বলেই কি দুঃখ পেয়ে চলে গেল মিনি!

মিনির সঙ্গে দেখা হলে তবে না জিজ্ঞেস করবে তিতলি!

বুবলি মোহর পিকলু ঋষি এই নিয়ে খুব হাসাহাসিও করছে। 'কি রে তিতলি? তোর মিনি তোকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে?'

সে তো করবেই। মিনিকে নিয়ে কম হিংসে ছিল ওদের!

কোথা থেকে এসেছিল মিনি কে জানে, ওর বাবা মা কেউ ছিল না, একদিন রাতের বেলায় এসে তিতলিদের সিঁড়ির কাছে শুয়েছিল। মর্নিং ওয়াকে যাবার সময় বাবা দেখতে পেয়েছিল প্রথম। তিতলিকে ডেকে দেখিয়েছিল। তখন তিতলি ওকে নিয়ে এল বাড়িতে। মাম দুধ খেতে দিল। সেইথেকে মিনি তিতলির বন্ধু।

পিকলুরা কত চেষ্টা করেছে ওকে নিয়ে যেতে। সুমি নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে দোলনায় বসিয়ে কত দোল দিয়েছে, যাতে মিনি ওদের বাড়িতে থাকে। ঋষি সাইকেলে করে ঘুরিয়েছে মিনিকে। মোহর মিনিকে থাম্‌স্ আপ খাইয়েছে। তবু মিনি রোজ তিতলির বাড়িতেই চলে আসত।

চোখে জল এসে গেল তিতলির।

বাবা বলে, 'অত মনখারাপ করে না। আমি আর একটা মিনি এনে দেব।'

মা বলে, 'মিনি বোধহয় ওর মায়ের কাছে চলে গেছে রে। তুই এত মনখারাপ করিস না।'

ঘর মুছতে মুছতে রূপামাসি বলে, 'না গো তিতলি। মিনি এখানেই আছে। লোকের বাড়ি বাড়ি চুরি করে খাচ্ছে তো, তাই লজ্জায় তোমার কাছে আসতে পারছে না।'

সেই তো। চুরি করা মহাপাপ। মিনিকে কে শেখাবে কথাটা! মিনি তো আর বই পড়তে পারে না। তবু তিতলি ভেবে রেখেছে, মিনি এলেই এই কথাটা শিখিয়ে দেবে ওকে। মিনি যে তিতলির সব কথা শোনে।

সেই সেবার মোহরদের পাঁচিল থেকে লাফ দিয়েছিল মিনি, মাম বলেছিল ওদের লাগে না, মিনির পায়ের পাতায় নাকি নরম নরম প্যাড আছে। তবু তিতলি খুব ভয় পেয়েছিল। পইপই করে শিখিয়েছে মিনিকে, যেন অত উঁচু থেকে লাফ না দেয়। মিনি সব কথা শুনেছে। আজকাল তো মিনি সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে উঠে আসত।

সে দেখে শর্মা-আঙ্কলের কি হাসি! মামকে ডেকে বলছিলেন, 'ভাবিজি, আপকে বিল্লি তো বিলকুল ইন্সান বন গয়া।'

'বিল্লি' শুনলেই দুঃখ পায় মিনি। তিতলি জানে। 'বেড়াল' বললেই মিনি অবাক হয়, সেখানে

'বিল্লি'! মিনি বোধহয় মনের দুঃখেই কোথাও চলে গেছে।

কাল ইউনিট টেস্ট আছে। মৃদুলাম্যাম বলেই দিয়েছেন, ইলেভেন থেকে ফিফটিন পুরো টেব্‌ল্‌স লিখতে হবে। যে ভুল করবে, তাকে তিনবার করে লিখতে হবে। কিন্তু তিতলির তো মনই বসছে না। মিনির জন্যে চিন্তায় চিন্তায় তিতলির যে কি অবস্থা, মামও জানে না। এই তো একটু আগে জোর করে একগ্লাস কমপ্ল্যান খাইয়ে গেল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নে তিতলি। আমি তরকারিটা নামিয়ে এসেই টেব্‌ল্‌স ধরব কিন্তু।'

কমপ্ল্যান খেতে গিয়ে তিতলির যে কত মনখারাপ করল, মাম কি বুঝলো? রোজ তিতলি চুপিচুপি হাফগ্লাস কমপ্ল্যান মিনিকে খাইয়ে দেয়, মাম তো জানেই না। কোথায় আছে মিনি, কি খাচ্ছে কে জানে। কে ওকে কমপ্ল্যান দেবে!

কলিংবেলের আওয়াজ।

বাবা এলো বোধহয়। বাবা এলেই হৈহৈ,বাবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে তিতলি রোজ। আজ ঘরে ঢুকেই জোরে জোরে ডাকছে বাবা,'ও তিতলি, শিগ্‌গির আয়। এখুনি কি দেখে এলাম বলি। আয় আয়,দেখবি তো এক্ষুনি বাইরে চল।'

মাম একটু একটু বারণ করছিল, 'কাল পরীক্ষা, ওকে ডিস্টার্ব করছ কেন' বলে। কিন্তু বাবার মুখ দেখেই তিতলি লাফ দিয়ে বাইরে এসেছে। নিশ্চয় মিনির খবর এনেছে বাবা।
ঠিক তাই।

সামনের ব্লকের পেছন দিয়ে গিয়ে .. সিনহা আন্টিদের ব্যালকনির পাশে যে একটা লাল মোসান্ডা গাছটা আছে .. তার নিচেই মিনি। সঙ্গে একটা অন্য বেড়াল। বাদামী-কালো ছোপ ছোপ, চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে, ইয়া মোটা, ল্যাজটাও ইয়া মোটা।

তিতলিদের দেখেই ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে বেড়ালটা। বাপরে! দেখেই ভয় লাগছে তিতলির।

মিনির কিন্তু একটুও ভয় নেই। ওর পাশে শান্ত নরম সরম মিনি চুপটি করে বসে আছে কেমন দ্যাখো!

বাবা বলল,'দা পার্টনার ইন ক্রাইম। ওই দ্যাখ তিতলি, ওটা একটা হুলো। হুলোবেড়াল। এবার বুঝলাম

কে চুরি করে করে খাচ্ছে।'

তিতলিকে দেখে আস্তে আস্তে উঠে এলো মিনি। হুলো ঘাড়ের লোম আরও ফুলিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ফ্যাঁশ করে উঠে এক লাফে সিনহা-আন্টিদের কার্নিশে উঠে পড়ল।

'মিনিকে বাড়ি নিয়ে যাই,বাবা?' আস্তে মিনিকে কোলে তুলে নিল তিতলি।

'না তিতলি,ও হুলোর কাছে থাক।'

'কিন্তু ওটা তো রাগী বেড়াল। মিনিকে যদি আঁচড়ে কামড়ে দেয়!'

'না রে। কিছু হবে না। মিনি হুলোকে খুঁজে এখানে এনেছে, নাকি হুলো মিনির জন্যে এখানে এসেছে, কে বলবে বল্? ওদেরও তো নিজের সঙ্গী চাই, না? মানুষের সঙ্গে থাকতে কি সবসময় ভালো লাগে?'

ভালো লাগে না?

মানুষের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না মিনির?

মিনি তো নিজে নিজেই এসেছিলো মানুষের কাছে। বাবা যে কি সব বলে!

'কি করবে বল্? মিনিদের যে আর থাকার জায়গাই নেই। মানুষ মিনিদের সব জায়গা নিয়ে নিয়েছে। বনজঙ্গল কেটে ফেলেছে, মাটির ওপর পিচ ঢেলে রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে, পাহাড়ের পাথর ভেঙে শহর বানিয়ে নিয়েছে। একটা গাছ নেই, একটা বুনোঝোপের জঙ্গল নেই .. মিনিরা যাবে কোথায়?

বাবার কাছে আশ্চর্য পৃথিবীর গল্প শুনে তিতলি তো অবাক। জল, মাটি আর আকাশের গল্প। মানুষের পৃথিবী ছাড়াও আর একটা মজার পৃথিবী।

সেখানে ঘাসে ঘাসে সবুজ মিষ্টি হাওয়া বয় .. গাছের পাতার দোলায় বাঁশির সুর শোনা যায় .. যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে, নীল পেখম তুলে নাচে ময়ূর। শীতকালে লম্বা ঘুম দেয় সাপেরা, সে ঘুম আর ভাঙতেই চায় না। আরশোলা পিঁপড়েও দেখা যায় না তখন। কাঠবেড়ালিরা খাবার গুছিয়ে লুকিয়ে পড়ে গাছের কোটরে। মিনিরা সকালের সোনা রোদ্দুরে আড়মোড়া ভেঙে খাবার খুঁজতে যায়। একটু আওয়াজ হলেই এক লাফে উঠে পড়ে গাছের ডালে। আর সেখানে দোল খেতে খেতে মিনিরা খাবার খোঁজার কথা ভুলে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে।

আবার শীত শেষ হয়ে বসন্তে যেই মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইবে, অমনি ন্যাড়া গাছের পাতার কুঁড়ি খুলে যাবে। কোনোটা কচি সবুজ, কোনোটা লালচে, কোনোটা বাদামী।জারুলগাছের পাতাগুলো আবার গোলাপী গোলাপী। পাখি কত। দোয়েল, ফিঙে, বেনেবৌ, কোকিল, বৌ-কথা-কও, ঘুঘু, পায়রা। জলাভুমি জুড়ে বুনোহাঁস।

একটু গরম পড়তেই কাঠবেড়ালিরা বেরিয়ে পড়বে। গাঁদাফুলের পাকা ফল, ঘাসের বিচি জমা করবে। তবে মিনিরা বড্ড নরম সরম, ওদের অত খাটুনি পোষায় না। ওরা মানুষের কাছাকাছি থাকতে বেশি ভালোবাসে।

'জানিস তিতলি, আমার ঠাকুমার একটা বেড়াল ছিল। রান্নাঘরের সামনে তাকে মাছ পাহারা দিতে

বসিয়ে ঠাকুমা চান করতে যেতেন। কি লক্ষ্মী বেড়াল, চুপ করে বসে থাকত। আর ঠাকুমা যখন মারা গেলেন, চারদিন একফোঁটা দুধ খায় নি, খাবার খায় নি, টসটস করে জল পড়ত চোখ দিয়ে। এক্কেবারে মানুষের মতো। সবাই অবাক। ওরা খুব ভালোবাসা চেনে রে তিতলি,' বাবা বলল। মিনিও যে এক্কেবারে মানুষের মতো, তা তো তিতলিও জানে। মিনি তিতলির সব কথা বোঝে। সব শোনে। সেই যে একবার স্কুলে টিফিন নিয়ে সুমেধার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল আর সুপ্রিয়াম্যাম তিতলিকেই শাস্তি দিয়েছিলেন, সেই কথাটা তো তিতলি মামকেও বলে নি। শুধু মিনি জানে।

আর সেই যে একবার মোহর-কিঙ্কিরা তিতলিকে কিছুতেই ব্যাডমিন্টন খেলায় নেয় নি, কত কষ্ট হয়েছিল তিতলির, সে কথাটাও তো শুধু মিনি জানে। মন দিয়ে তিতলির সব কথা শুনত মিনি। স-অ-ব। সেইজন্যেই তো মিনি হুলোর কাছে চলে গেল বলে এত কষ্ট হচ্ছে তিতলির।

তবে বাবার কথা শুনে তিতলির এখন মনে হচ্ছে, মিনি যেমন ওর সব কথা বোঝে .. তিতলি কিন্তু মিনির কষ্টটা তেমন করে বোঝেই নি।

আহা রে! মা নেই, বাবা নেই .. মিনির আশ্চর্য সুন্দর সবুজ পৃথিবীটাও নেই .. মিনির তো খুব কষ্ট। মিনিই বা একা থাকে কি করে! ভাগ্যিস হুলো এসেছে!

থাক মিনি, তুই হুলোর কাছেই থাক। হুলো রে, তুই মিনিকে কোনো কষ্ট দিস না, রেগে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে দিস না। বাবা বলেছিল,'দেখিস তিতলি, মিনি রোজ তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওরা খুব ভালোবাসা চেনে।'

তাই হোক। মিনি, তুই হুলোর কাছেই থাক .. শুধু রোজ একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাস।

মনে মনে মিনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ব্যালকনিতে এসেছে তিতলি।

আর .. ওমা!

মিনি গুটিসুটি করে বারান্দায় রাখা চেয়ারটার ওপর বসে আছে যে! হুলোও ছিল, তিতলিকে দেখে এক লাফে নেমে কার্নিশে দাঁড়ালো। মিনি মুখ তুলে দেখলো, তারপর আস্তে উঠে উঠে আড়মোড়া ভেঙে লাফিয়ে নামল হুলোর পাশে। কার্নিশে দাঁড়িয়ে হুলো-মিনি তিতলির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল তারপর।

আইভি চ্যাটার্জি
জামশেদপুর, ঝাড়খন্ড

লালকন্ঠের স্বপ্নপূরণ

লালকন্ঠ সারসের মন মেজাজ বেজায় খারাপ। সেই শীতের শুরুতে যখন উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে একটু একটু করে, আর তার দুধ সাদা পালকের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝেই কনকনিয়ে দিচ্ছে শরীর, তখন সাত-তাড়াতাড়ি করে উড়ে চলে এল দক্ষিনে। দক্ষিনের দিকে শীত কম, রোদ্দুর বেশি। লালকন্ঠ প্রত্যেকবারই শীতে উড়ে আসে দক্ষিন দিকে। এটাই তো নিয়ম। কোন কোন বার কোন দলের সঙ্গে, কখনো আবার একা। আবার শীত শেষ হলে উড়ে যায় উত্তরে। তখন আবার দক্ষিনে বড় বেশী গরম।

প্রত্যেকবারের মত, এবারো লালকন্ঠ এসে নেমেছে পূবদিকের এক মস্ত বড় শহরের চিড়িয়াখানায়। তার যে সব বন্ধুরা সাথে উড়ছিল, তারা অবশ্য আরো খানিকটা এগিয়ে নামবে অন্য একটা বড় ঝিলে। কিন্তু লালকন্ঠের এই চিড়িয়াখানাটাই পছন্দ। মাঝখানে একটা ছোটখাটো ঝিল আছে। সেখানে অন্যান্য দেশ থেকে উড়ে আসা আরো পাখিদের সাথে দেখা হয়। উপরি পাওনা অন্যান্য জন্তুরা। গতবছর হাতি পার্বতীর একটা ছোট বাচ্চা হতে দেখে গেছিল। একবছরে নিশ্চয় অনেকটা বড় হয়ে গেছে।
চিড়িয়াখানার হরিণদের সাথে লালকন্ঠের ভালো আলাপ আছে। নানারকম হরিণের মধ্যে বুড়ো সম্বর হরিণ বিষ্ণুর সাথে লালকন্ঠের ভালো বন্ধুত্ব। দুজনে বসে নানারকম সুখ-দুঃখের গল্প হয়। বিষ্ণুর জন্ম হয়েছিল এই চিড়িয়াখানাতেই। সত্যিকারের জঙ্গল, খোলা মাঠ বা বিশাল নদী, কিছুই দেখেনি সে। তাই লালকন্ঠের কাছ থেকে দেশ - বিদেশের গল্প শুনতে ভালবাসে সে। দুজনে সারা দুপুর রোদের ওমে ঘুরে -ফিরে বকর বকর করে, মাঝে মাঝে বিষ্ণুর বরাদ্দ ছোলাও খায় লালকন্ঠ।

এইসব ভেবেই এবারো অন্য সঙ্গীদের ছেড়ে এখানে নেমে পড়া। কিন্তু নেমে ইস্তক মন খারাপ হয়ে

আছে। চিড়িয়াখানার দিকে আর তাকানো যায়না। চারদিক ধুলোয় ধুলোময়, অপরিচ্ছন্ন। মাঝে অত সুন্দর ঝিল, যার পাড়ে খাবার খুঁজতে খুঁজতে বিদেশী পাখিদের সাথে কাটিয়ে দেওয়া যেত সারা দুপুর, মাঝে মাঝে স্নান ও করা যেত, সেটা ঢেকে আছে শ্যাওলা আর দামে। সব থেকে নোংরা হয়ে আছে খাঁচাগুলির মাঝে মাঝে ছড়িয়ে থাকা খোলা লন এবং মাঠ। কাগজের টুকরো, পলিথিনের প্যাকেট, খালি জলের বোতল, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে। এত নোংরা কারোর ভালো লাগে!! মানুষগুলো যেন কিরকম। এদিকে তো নিজেরা দিব্বি ঝকঝকে পোষাক পড়ে ঘুরছে, খাচ্ছে, খেলছে...এই চিড়িয়াখানা তো ওদেরি জন্য। অথচ, দেখো, একবার - নিজেদের জিনিষ কে সুন্দর রাখার কোন চেষ্টাই নেই। একেই তো শহরের হাওয়ায় এত ধুলো-ময়লা যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। একটু উড়লেই দম নিতে কষ্ট হয়। তার ওপর যদি থাকার জায়গাটা এত খারাপ হয়, তাহলে কারো মন -মেজাজ ঠিক থাকে?

লালকন্ঠের সঙ্গীরা এই অবস্থার খবর আগেই পেয়ে গেছিল। তাই ওরা আর এখানে নামেনি। ওদের মধ্যে কেউ কেউ তো আরো দক্ষিনে সেই সুন্দরবনে চলে যাবে। ওরা তো তাকে বারন ও করেছিল। কিন্তু সে-ই কোন কথা না শুনে নেমে পড়ল।

এবার অন্য দেশ থেকেও এখানে অনেক কম পাখী এসেছে। কয়েকবছর আগে অবধি জলের ধারের ঘাসজমিতে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যেত না। খাবার নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া লেগে যেত। এবার তো কেউ আসেই নি। লালকন্ঠ গুনে দেখেছে জনা পনেরো মত বিদেশী অতিথি আছে।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে বিষ্ণুর সঙ্গে এইসব নিয়েই কথা হচ্ছিল লালকন্ঠের। সকালের নরম রোদে বেশ আরাম আরাম লাগছে...কিন্তু গা ঝাড়া দিয়ে উঠল লালকন্ঠ। এখনো চিড়িয়াখানার দরজা খোলা হয়নি। এই সময়টা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো যায়। যখন চিড়িয়াখানায় ভিড় হয়ে যায়, তখন সে ঝিলের ঘেরা নীচু পাঁচিলের ভেতরেই ঘোরাফেরা করে। পার্বতীর মেয়ে রাধা কে একবার দেখে এলে হয়। খুব মজাদার হয়েছে বাচ্চাটা। ওদের থাকার খোলা জায়গাটায় মায়ের সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায়। ছোট্ট শুঁড় দিয়ে একটা পুরোনো গাছের গুঁড়িকে ঠেলার চেষ্টা করে। বড় বড় পা ফেলে, খানিক উড়ে, খানিক হেঁটে, হাতিদের ঘেরা মাঠের দিকে পা বাড়াল লালকন্ঠ। যাওয়ার পথে পড়ল জিরাফের থাকার জায়গা। ঘেরা জায়গার মধ্যে বড় গাছটার পাতা ভেঙ্গে, বউ-বাচ্চা নিয়ে জিরাফ জ্যাক সকালবেলার জলখাবার খাচ্ছে। দাঁড়িয়ে একটু কুশল বিনিময় হল দুজনের। জ্যাক একটু চুপচাপ থাকে। তবে মন ভালো থাকলে ওর কাছ থেকে ভালো ভালো গল্প শুনতে পাওয়া যায়। সেই কোন দূর মহাদেশ আফ্রিকা থেকে কাঠের বাক্সে বন্দী করে ওকে নিয়ে এসেছিল এখানে। ওর পরে এসেছে ওর সঙ্গিনী জিল। ওদের একটা তুরতুরে বাচ্চা হয়েছে। সেই ছোট্ট জনি এখনো বাবার মত লম্বা হয়নি, তাই তার মা উঁচু ডাল থেকে পাতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে তাকে খেতে দিচ্ছে।

সাদা বাঘ শক্তির খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লালকন্ঠ। এক বছর আগেও শক্তিকে ছোট ছেলেই বলা যেত। কিন্তু এখন শক্তির চেহারা বিশাল - একদম বড়সড় হয়ে গেছে সে। খুব রাগিও হয়েছে। খাঁচায় বন্দি থাকতে একদম ভালো লাগে না তার। পাশের খাঁচার বুড়ো বাঘ পরম-এর কাছ থেকে সুন্দরবনের গল্প শুনেছে সে। তাই সে সুন্দরবনে যেতে চায়, যেখানে বাঘেরা স্বাধীন। রাজার চালে খাঁচার পরিসরের ভিতর পায়চারি করছে শক্তি। লালকন্ঠকে দেখে বড় বড় চোখে তাকালো একবার। তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার উল্টোদিকে চলে গেল। লালকন্ঠ আর দাঁড়াল না। কে

জানে বাবা, কোনদিন বাগে পেলে হয়ত তার ঘাড়েই না হালুম করে এসে পড়ে!

পার্বতী আর রাধার সাথে দেখা করে ফেরার পথে দুটো কাজ আছে। আসার পথে দেখে এসেছে, ফেজ্যান্ট আরুশার সঙ্গে খাঁচায় এক নতুন পাখী। কি তার রূপ! কালচে লাল ভেলভেটের মত মসৃন পালকে ঢাকা শরীর, মাথার পালক গুলি আবার সোনালি রেশমের মত। গলার কাছে গোল করে লাল-হলুদ কলারের মত পালকের আস্তরন। দেখলে মনে হয় ঠিক যেন রানীর মত পোষাক পড়ে আছে। আরুশা বলল মোটে দুই দিন হল এসেছে, তাই খুব মুষড়ে পড়ে আছে। ওর সঙ্গে একটু গল্প করে আসতে হবে। আসলে এত সুন্দরী পাখি দেখে লালকন্ঠের একটু ভাব করতে ইচ্ছা হয়েছে। ময়ূর নীলাদ্রিকে যদি একবার দেখাতে পারত!! নীলাদ্রি সুন্দর বলে তার খুব অহংকার, কারোর সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না! লালকন্ঠকে তো পাত্তাই দেয় না। একদিন বলেছিল - কি বিচ্ছিরি লম্বা লম্বা পা! আচ্ছা, এতে লালকন্ঠের কি করার আছে? প্রকৃতি মা যদি তাকে এইরকম করে গড়ে তোলেন! লালকন্ঠ কিছু বলে না। সে তো জানে, সে অন্য অনেক সারসের থেকে লম্বায় অনেক বড়,তার ডানায় কত জোর!!...এই নতুন নাম না জানা পাখি, যে নাকি পৃথিবীর অন্য প্রান্তের দক্ষিন আমেরিকা থেকে এখানে এসেছে, সে নিশ্চয় নীলাদ্রি ময়ূরের মত হবেনা...

ওদিকে আবার গতকাল দুপুরবেলায় শিম্পাঞ্জি বীরেশ্বর এক কান্ড ঘটিয়েছে। ওকে দেখতে এসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওর দিকে কলা, বাদাম এইসব ছুঁড়ে দিচ্ছিল। বীরেশ্বর ও দিব্বি বসে বসে খাচ্ছিল। এমন সময় একটা লোক আচমকা বীরেশ্বর-এর দিকে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে। কেন যে মারল!! মানুষগুলোর কি মাথায় কোন বুদ্ধি নেই? বীরেশ্বরের মাথায় ভালোই লেগেছিল। তাই বীরেশ্বর উলটে রেগে গিয়ে সেই পাথরটাই ছুঁড়ে মারে বাইরের দিকে। পাথরটা গিয়ে সোজা লাগে একটা ছোট্ট মেয়ের কপালে। কপাল ফেটে রক্তও বেরোয়। বীরেশ্বর ও খুব ঘাবড়ে গেছিল। পরিখার পাশ থেকে অনেক দূরে এক কোনায় চলে গিয়ে বসে ছিল বাকি দিনটা। ওকে অবশ্য চিড়িয়াখানার ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। কিন্তু বেচারা গতকাল থেকে খুবই মন খারাপ করে বসে আছে। বার বার বলছে ও আসলে ওই ছোট্ট মেয়েটাকে আঘাত করতে চায়নি...ওর সঙ্গেও দেখা করা দরকার। ব্যথাটা কমল কিনা কে জানে!!

মাঝে মাঝে নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করে লালকন্ঠ। সে চিড়িয়াখানায় বন্দী নয়। ইচ্ছামত দেশ-বিদেশে ঘুরতে পারে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে খাবার জিনিষ সব সময় পাওয়া যায়না। আজকাল তো বিস্তীর্ণ মাঠ বা জলা জায়গা খুঁজে বার করাই অসাধ্য হয়ে গেছে। চারিদিকে শুধু উঁচু উঁচু গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে ওঠা মানুষদের থাকার বাড়ি। শীতে উড়ে আসতে হয় এদিকে, গ্রীষ্মে আবার ফিরতে হয় উত্তরে। অবশ্য লালকন্ঠের প্রজাতির সব সারসই যে উড়ে আসে দক্ষিনে, তা নয়। অনেকেই আসে না। কিন্তু লালকন্ঠ আসে। তার ভালো লাগে আসতে। শীত ও একটু কম লাগে। তবে খাল বিলের ধারই বলো, বা তার উড়ে আসার পথ, সবেই আছে নানারকম বিপদ। সবসময় হুঁশিয়ার থাকতে হয়। কিন্তু তাও, সব মিলিয়ে দেখতে গেলে লালকন্ঠ ভালোই আছে। অন্তঃত ঘুরে ফিরে সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও তো হয়। বাঘ, সিংহ থেকে জেব্রা, হরিণ, হাতি, এমনকি, পুঁচকে খরগোশগুলোর সঙ্গেও তার ভাব আছে। অথচ দেখো, এই যে রাধা আর জনি, দুটো বাচ্চারই তো এক বয়স, কিন্তু একে অপরের সঙ্গে আলাপ তো দূর, মুখই দেখতে পায়না। তার মুখে জনির লম্বা গলার কথা শুনে তো ছোট্ট রাধা হেসেই গড়িয়ে পড়ল। ওদিকে জনি যেই শুনল হাতিদের লম্বা শুঁড়ের কথা, অমনি এমনভাবে তাকালো যেন লালকন্ঠ বানিয়ে বানিয়ে বলছে!! আহা রে...ওরা যদি একসঙ্গে খেলাধুলো করতে পারত...

শীত শেষ হয়ে আসে। বাতাসের শিরশিরানি কেটে গিয়ে দক্ষিন দিক থেকে ভেসে আসে নরম গরম দখিনা হাওয়া। রোদের উষ্ণতা বাড়তে থাকে। লালকন্ঠ বুঝতে পারে এবার ফিরে যাওয়ার দিন এল - আবার সেই উত্তরে। এই কদিনে চিড়িয়াখানার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। দলে দলে মানুষ এসেছে, পশুপাখিদের দেখেছে, মাঠে বসে খাওয়াদাওয়া করেছে, আর ফেলে রেখে গেছে আরো আবর্জনা। বাতাসময় ধুলো আর শুকনো পাতার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে পলিথিনের ব্যাগ। বুড়ি সিংহি কৃষ্ণা তো রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এর পরের বার আর এখানে আসা যাবেনা - ভাবে লালকন্ঠ। খুঁজে নিতে হবে অন্য কোন জায়গা, যেখানে হয়ত দেখা হয়ে যাবে সাইবেরিয়ার পুরোনো বন্ধুদের সাথে। আগামি কালই ভোর ভোর বেড়িয়ে পরবে সে।

বিষ্ণুর ছোলায় ভাগ বসাতে বসাতে লালকন্ঠ দেখতে পেল - একটা ছোট মেয়ে, তার পরনে সবুজ পোষাক, হাতে একটা থলি, সে সামনের মাঠ থেকে কি সব কুড়োচ্ছে। ভালো করে দেখার জন্য কাঁটাতারের বেড়ার কাছে চলে আসে লালকন্ঠ। তারপরেই অবাক হয়ে যায়...আরে!! একটা নয়, বেশ অনেক ছোট ছোট মেয়ে আর ছেলে, সবুজ পোষাক পড়ে, হাতে থলি নিয়ে মাঠের মধ্যে রয়েছে। তারা মাঠ থেকে নোংরা কাগজ, খাবারের প্যাকেট, এইসব তুলে তুলে তাদের থলিতে জমা করছে। কেউ কেউ আবার পাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে আশেপাশের গাছপালাগুলো। ওদের সঙ্গে রয়েছে চিড়িয়াখানার কর্মীরাও। তারা পরিষ্কার করছে পরিখাগুলির জল।

দেখতে দেখতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে উঠল চিড়িয়াখানার চত্বর। লালকন্ঠ এইসবের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। বীরেশ্বর বেশ খুশি তার পরিখার জলটা পরিষ্কার করে দেওয়ায়। এতদিন সে ভালো করে নিজের মুখটাও দেখতে পাচ্ছিল না!! মুনিয়া পাখি গুলি নিজেদের মধ্যে এত কলরবলর করছে যে ওদের সঙ্গে কথাই বলা গেলনা। গম্ভীর পন্ডিত ধনেশ পাখি অবশ্য মুখ বেঁকিয়ে বলেছে - দেখো কতদিন পরিষ্কার থাকে!! তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে প্যাঁচালো গলা পেলিক্যান গুলো। বিজ্ঞ বিজ্ঞ গলায় বলেছে - এইসব এই একদিনই হবে!! ওদের থেকে ভালো শান্ত -শিষ্ট হরিণেরা। তারা একবাক্যে জানিয়েছে তাদের ব্যাপারটা বেশ পছন্দ হয়েছে - তাও তো কিছু মানুষের টনক নড়েছে!!

ইতিমধ্যে চিড়িয়াখানার দরজা খুলে গেছে। ক্রমে ক্রমে বাড়ছে মানুষের ভীড়। লালকন্ঠ দেখলো সেই সবুজ পোষাক পরা ছোটরা সবাইকে বোঝাচ্ছে পরিবেশ কে পরিষ্কার রাখতে। কেউ ভুল করে ঠোঙ্গা বা জলের বোতল মাঠে ফেললে, তার সঙ্গে কথা বলে তাকে দিয়ে সেই জিনিষ বড় বড় ময়লা ফেলার পাত্রে জমা করাচ্ছে।

দিনের শেষে একটা বড় গাড়ি করে যখন সব ময়লা তুলে নিয়ে চলে গেল, তখন বেশ খুশি খুশি মন নিয়ে লালকন্ঠ ঘুমতে গেল। ভাবল, কালকেও কি এমনি হবে? নাকি, ধনেশ পন্ডিত আর প্যাঁচালো পেলিক্যান গুলোর কথাই সত্যি হবে?

পরের দিন সকালে কিন্তু ওরা আবার এল। একই রকম পোষাক পরা অন্য আরো একদল ছেলেমেয়ে...তার পরের দিন ও এল...কাকাতুয়া বাক্যবাগীশ লালকন্ঠকে খবর দিল যে এরকম নাকি রোজই হবে। বকবকে কাকাতুয়ার বন্ধু শহুরে কাকের দল, যারা সারা শহরময় ঘুরে বেড়ায় আর সব্বার হাঁড়ির খবর রাখে, তারাই জানিয়েছে একথা। প্রতিদিনই একদল করে শিশু আসবে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের চিড়িয়াখানা পরিষ্কার রাখার জন্য।

আরো কিছুদিন পরে এক হালকা কুয়াশামাখা ভোরবেলায় লালকন্ঠ তার বিশাল দুটি ডানা ছড়িয়ে ভেসে উঠল আকাশে। পূবের আকাশ লাল করে তখন সবে সূর্যদেব উঠেছেন। সেই লাল- সোনালি নরম আলোয় ঝকঝকে সুন্দর চিড়িয়াখানাকে পেছনে ফেলে নীল আকাশে উড়ে চলল লালকন্ঠ। এবার সে নিশ্চিন্ত। তার বন্ধুরা আর ধুলো ময়লার মধ্যে থাকবে না। আর আগামি বছর সে আবার ফিরে আসবে এখানে। লালকন্ঠ নিশ্চিত, আগামি বছরও এসে সে তার চিড়িয়াখানাকে একইরকম দেখতে পাবে - ঝকঝকে, পরিষ্কার, প্রানের আনন্দে ভরপুর - তার পরিযায়ী জীবনের ছোট্ট এক স্বপ্ন।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৫

পর্ব -৫

গত সংখ্যায় প্রানগোপালদার কথা লিখেছি, যে কিনা রাতে মামার দোকান পাহারা দিতে আসতো। আর আসার সময় গান গাইতো আর হাতের বড়-সড় লাঠিটা মাটিতে ঠুকতো ঠকাস ঠকাস করে। সে লাঠিটা অত জোরে ঠোকে কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলতো, গানের সাথে তাল ঠুকি, মনে সাহস জোগাই, আর একটা বড় কাজ করি - চলার পথ থেকে সাপ তাড়াই। শেষের ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি, আর প্রানগোপালদাকে জিজ্ঞেস করেও জানতে পারিনি।

পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে সাপেরা কানে শুনতে পায় না, মাটি কাঁপলে বুঝতে পারে যে কেউ আশেপাশে আছে। তাই লাঠির ঘায়ে মাটি কাঁপলে ওরা ঝামেলা এড়াতে সরে যায় রাস্তা থেকে; ভীতু কিনা! সুতরাং ছোবল খাবার ভয় থাকেনা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চললে।

পুজো তো এসে গেলো। এবার একটু আগেই এলো। খুব মজা করবে তো? আমিও করতাম সেই ছোট্টবেলায় যখন তোমার মতো ছিলাম। তবে সে মজাটা এখনকার মতো ছিলোনা। একটু অন্য রকম ছিলো।

পুজোর মজাগুলো কি বলোতো? বাবা-মায়ের সাথে বাজার করতে গিয়ে পছন্দ মতো নতুন জামা, জুতো কেনা, তারপর পুজো যত এগিয়ে আসবে, পাড়ার পুজো মন্ডপের সেজে ওঠা, এরপর মহালয়া, তারপর স্কুল ছুটি হওয়া- এসব হতে হতেই হুড়মুড় করে পুজো এসে পড়া। তারপর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দর্শন।

আমার ছোটবেলায় ঠিক এরকম ছিলো না পুজো ব্যাপারটা। নতুন জামা-প্যান্ট বড়রা কিনে আনতেন। যেমন দিয়ানী দিতেন। আমাদের বাড়ি, অর্থাৎ পাবনা থেকেও আসতো। বোধ হয় মোট দু-প্রস্থই হতো। 'বোধ হয়' বললাম এজন্য যে ঠিক মনে পড়ছে না কতগুলি করে পোষাক পেতাম পুজোতে।

আসলে মামার বাড়ির গ্রামে পুজোর নতুন জামা -কাপড় পড়ে অত ঘোরার জায়গাই ছিলো না। গ্রামে সম্ভবতঃ একটাই পুজো হতো কোন এক বড়লোকের বাড়িতে। ছোট একচালা প্রতিমা হতো সেটা। তখন আজকের মতো এতো নানা ধরনের প্রতিমা হতো না। মামারা কেউ একবার নিয়ে যেতেন প্রতিমা দর্শন

করাতে, তাও দিনের বেলায়। ব্যস, ওই পর্যন্তই।

সেখানে তো বিদ্যুতের আলো ছিলো না, রেডিও-ও ছিলো না, তাই মহালয়ার ভোরে মহিষাসুরমর্দিনী শোনারও কোন ব্যাপার ছিল না।

তাহলে আমরা কি পুজোয় কোন আনন্দ করতাম না? আমার কাছে আসল মজাটা ছিল অবশ্য অন্য জায়গায়। সে সব বললে তোমার ভালো লাগতেও পারে আবার নাও পারে। বর্ষাকালে বড় নদীর (যমুনা নদী) উপচে পড়া বেনোজলে চারিদিক থৈ থৈ করতো। বাড়ি-ঘর সাধারনতঃ উঁচু জায়গায় করা হতো। তাই চারিদিকে জল থাকলেও বাড়ি ডুবতো না।

দীর্ঘ সময় জলে ডুবে থাকার কারণে মাঠের ঘাস আর অন্য সব জংলা গাছ মরে পচে যেতো। জল নেমে গেলেও পায়ে চলা ভারি অসুবিধা হতো, গা ঘিনঘিন করতো একেবারে।

কিন্তু কবে মাঠ শুকোবে তারপর হাঁটা হবে -এভাবে তো বেশিদিন চলা যেত না। তাই কেউ না কেউ একদিন লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই পচা ঘাস ডিঙ্গিয়ে যাওয়া শুরু করতো।

ব্যস, তারপর শুরু হতো প্রথম ফেলা পায়ের দাগের ওপর পা ফেলে চলার কসরত যাতে পায়ে কাদা না লাগে। সবাই তো আর পারতো না ঠিক ঠিক জায়গায় পা ফেলতে- এদিক ওদিক হয়েই যেতো। ক্রমশঃ সেই পায়ের দাগের আকার বাড়তো। বাড়তে বাড়তে সেগুলো সব জুড়ে জুড়ে পায়ে চলা শুঁড়িপথ তৈরি হত একটা।

এর মধ্যে আশ্বিনের কড়া রোদে ভেজা মাঠ-ঘাট সব শুকোতে শুরু করতো। আর মড়া পচা ঘাসের মধ্যে গজিয়ে উঠতো কচি কচি নতুন ঘাস। ধীরে ধীরে কুৎসিত মাঠ-ঘাট ভরে যেতো সবুজ ঘাসে, যেন নতুন জামা পড়তো পুজোয়।

সেই আশ্বিন মাসের দিনে কড়া রোদ থাকলেও সন্ধ্যায় কিন্তু শুরু হত হিম পড়া। দিয়ানী সাবধান করতেন, যেন হিম লাগিয়ে অসুখ- বিসুখ না বাধাই।

হিমের সাথে শুরু হতো মিষ্টি গন্ধের আনাগোনা। কিসের বলতো? শিউলি ফুলের। সন্ধ্যা থেকে চারিদিকের বাতাস মাঠ-ঘাট সব শিউলির গন্ধে ম' ম' করতো; সবার বাড়িতেই শিউলি গাছ ছিলো কিনা।

ভোর বেলাতে শিউলি কুড়োবার ধুম পড়ে যেতো। বাড়ির নিত্য পুজোর কাজে তো লাগতোই, এছাড়া শিউলি কুড়োতাম আরো একটা কারণে। সেটা পরে কোনও সময় বলবো। কারণ ওটা পুজোর সাথে যুক্ত নয়, তাই এখন বলবো না।

শিউলির সাথে আরো দু'রকম ফুল পুজোর আগমন বার্তা নিয়ে আসতো। এর মধ্যে প্রথমটা হলো স্থলপদ্ম। বড় বড় থোকা থোকা সাদা বা গোলাপি রঙের ফুল, গাছ ভরে ফুটে থাকতো। সকালে ফুটে দুপুরের মধ্যেই আরো লালচে রঙের হয়ে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে কুঁকড়ে যেতো।

আর অন্য ফুলটা ছিলো শাপলা। পদ্ম থাকলেও সর্বত্র ফুটতো না। পদ্মের থেকেও আমার ভালো লাগতো শাপলা।

পদ্মফুল তো নিশ্চয় দেখেছো? শাপলা দেখেছো কি? গ্রামাঞ্চলে যারা থাকো তারাতো দেখেইছো। শহরে যারা থাকো তারা একদিন গ্রামে বেড়াতে যেও, দেখা পেয়ে যেতেও পারো।

দু'রকমের শাপলা হতো। একরকম হলো লাল। আর অন্য রকমেরটা হলো সাদা, সাদা পাপড়ির তলার দিকটা আবার সবুজ।

শাপলার সাথে সাথেই শালুক কথাটাও এসে পড়ে। শাপলা, শালুক নিয়ে কয়েকটা কথা এই ফাঁকে তোমাকে জানিয়ে রাখি।

এরা একটা গাছেরই দুটো অংশ। পুকুরের একেবারে নিচে মাটির মধ্যে থাকে শালুক। শালুক থেকে শাপলার ফুল ও পাতার মুকুল বেরিয়ে জলকে আশ্রয় করে একেবারে জলের ওপর পর্যন্ত চলে আসে। পাতাগুলি জলতলে জলের ওপর ভেসে থাকে। আর ফুলের কুঁড়ি জলতলের কিছুটা ওপরের উঠে পড়ে ও পরে ফুল ফোটে। শালুক আসলে কান্ড না মূল সেটা বলতে পারবো না। এটা তোমাকে জীবন বিজ্ঞান যিনি পড়ান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে ভালো করে জানতে পারবে। আমার ধারণা শালুক কতকটা রাঙা আলু বা কচুর মতন যা কিনা মাটিতে থাকে। আর ফুল পাতা মাটির ওপরে থাকে।

পুকুরের জলে পাতা সহ শাপলা ফুল দেখতে ভারি ভালো লাগে।

শালুক কিন্তু খাওয়া যায়। যেটুকু মনে পড়ে আমিও খেয়েছি কাঁচা অবস্থায়। বিশেষ ভালো লাগেনি। তবে শুনতাম শালুক নাকি পুড়িয়ে খাওয়া যায় আর ভালোও লাগে। আর অনেকেই শাপলা ডাঁটার তরকারি খেতে ভালোবাসেন।

শাপলা ফুল শুকিয়ে গেলে ফুলের বীজের আধারটা ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। একে বলে 'ঢ্যাপ'। ঢ্যাপ পাকলে গ্রামের লোকেরা সেগুলি তুলে এনে বিক্রি করতো।

ঢ্যাপের মধ্যে বীজ থাকতো কালো কালো সর্ষের মতো দেখতে। বীজগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে বালির খোলায় ভাজতেন দিয়ানী। ছোট্ট ছোট্ট খই হতো তার থেকে। শেষ পর্যন্ত হতো সেই খইয়ের মোয়া। খুব ভালবাসতাম সেই ঢ্যাপের মোয়া খেতে।

আর কাশফুলের কথাটা তো বললামই না। গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল ফুটতো চারিদিকের ক্ষেত খামারের নানা জায়গায়, বিশেষ করে ক্ষেতের আলে। আল মানে বুঝলে? আল হল দুটি ক্ষেতের সীমানা নির্দেশকারী একটু উঁচু রাস্তার মতো জায়গা।

দূর থেকে দেখেই মনটা উড়ু উড়ু করতো পুজোর কথা ভেবে। ঠিক দুর্গা পুজো না, লক্ষ্মী পুজোর কথা ভেবে। একথা কেনো বললাম জানো?

আমাদের ছোটবেলায় সেই গ্রামে পুজোর আসল মজাটা ছিলো লক্ষ্মীপুজোয়। ছোট-বড় সকলেই লক্ষ্মীপুজোর অপেক্ষায় থাকতো। পাড়ার সব বাড়িতেই লক্ষ্মী পুজো হতো ধুমধাম করে। আমাদের অর্থাৎ ছোটদের আনন্দটা ছিলো বোধহয় বেশি।

পুজোর দিন সন্ধ্যায় পুজো হয়ে যাওয়ার পর আমরা অর্থাৎ পাড়ার সব ছোটরা দল বেঁধে বেড়িয়ে পড়তাম বাড়ি বাড়ি "কোজাগরী" করতে বা প্রসাদ খেতে। জানো বোধ হয়, দুর্গাপুজোর পর যে লক্ষ্মীপুজো হয়, তাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বলে।

এই সময় প্রত্যেকের কাছে থাকতো একটা করে কাপড়ের ছোট থলি। দিয়ানী প্রতি বছর একটা করে আমাকে বানিয়ে দিতেন।

থলি থাকতো কেন বলতো? সব বাড়িতেই তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, তক্তি, বাড়িতে তৈর ক্ষীরের সন্দেশ, এইসব ভালো ভালো জিনিষ খেতে দেবে। কতো খাওয়া যায়? দু'একটা মুখে দিয়ে বাকিটা থলিতে রাখতাম। এরকম করে থলিটা একেবারে ভর্তি হয়ে যেতো। এটাই ছিল রেওয়াজ। কাজেই থলিতে বাড়ি নিয়ে আসায় কোন লজ্জার ব্যাপার ছিলো না। বরং পরদিন সব বন্ধুরা মিলে বড়াই করতাম যে কে কত বেশি সংগ্রহ করতে পেরেছে।

একবার কি হয়েছিলো শোনো। মাথায় কি যে ভূত চাপলো। আমি আর আমার মাসতুতো ভাই স্থির করলাম যে আমরা একটা ছোট করে লক্ষ্মীপুজো করবো।

ভেতরের উঠোনে হবিষ্য ঘরের পেছনে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার আর ফাঁকা ছিলো, যদিও একটু তফাতে ঝোপঝাড় ছিলো। ঠিক করা হলো ওখানেই পুজো করবো। শুলে বড়রা আপত্তি করলেন। কারণ, বাড়ির পুজোটা দাদুর ঘরে হবে, সবাই মাঝের উঠোনে ব্যস্ত থাকবে; আর আমরা ভেতরের উঠনে একা থাকবো, সেটা ঠিক হবেনা।

কিন্তু কে শোনে সেসব কথা! একবার যখন মনে হয়েছে তখন করতেই হবে। ছোট্ট একটা ঘর বানিয়েছিলাম পাটকাঠি আর বাঁশের বাখারি দিয়ে। তারপর পাটকাঠির বেড়ায় গোবর কাদা দিয়ে লেপে দারুণ সুন্দর ঘর হয়েছিলো সেটা।

আর প্রতিমা? দিয়ানীর একটা পেতলের পঞ্চপ্রদীপ ছিলো - একটি মেয়ে পঞ্চপ্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সেটা চেয়ে নিয়ে প্রতিমা বানানো হলো।

এর পর ফুল, প্রসাদ, সবই যোগাড় হলো।

কিন্তু মুশকিল হলো পুজোর সন্ধ্যায়। সত্যি করেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো বাড়ির আসল পুজোয়।

আমাদের কাছে বড়রা কেউই রইলেন না। ভয় ভয় করতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে নানারকম আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে মানে মানে সরে পড়লাম আর কি! শেষে যা হবার তাই হলো। দিয়ানীর কাছে বকুনি জুটলো ভাল মতই।

এরপর বন্ধুরা সবাই এসে পড়লো কোজাগরী করতে। আমরাও বেড়িয়ে পড়লাম ওদের সাথে। আর আলাদা করে লক্ষ্মী পুজো করার কথা ভাবিনি কখনও।

(ক্রমশঃ)

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

মনের মানুষ: রূপকথার ভান্ডারী

রূপকথার ভান্ডারী

রূপকথার গল্প শুনতে কে না ভালোবাসে? মানো চাই না মানো - তুমি যতই বড় হও বা ছোট, ক্লাসের মনিটরই হও বা সাইকেল রেসের চ্যাম্পিয়ন - তুমিও পছন্দ করো রূপকথার গল্প পড়তে। রাজা-রানী-রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাক্ষস-পরী-ডাইনী- ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী-পক্ষিরাজ ঘোড়া - শীতের রাতে লেপের তলায়ই হোক, বা গরমের ছুটির দুপুরে, বা বর্ষার বিকেলে - এইসব গল্প সবসময়েই দারুণ লাগে পড়তে। আর যদি কেউ পাশে শুয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প বলে, তাহলে তুমি পাশবালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়েই পড়তে পারো...তাই না?

আচ্ছা ভাবো তো একবার - এই সব রূপকথা এলো কোথা থেকে? কে বা কারা লিখেছিলেন আমাদের এই ভালোলাগা গল্পগুলি? জানলে অবাক হবে, পৃথিবীর সব দেশেই, আর আমাদের বাংলাদেশে তো বটেই, রূপকথার গল্প কিন্তু বহুদিন বেঁচে ছিলো লোকের মুখে মুখে। সেইইই কোন হারিয়ে যাওয়া সময়ে, হয়তো কোন এক চাঁদনি রাতে, কোন এক দিদিমা তাঁর নাতি-নাতনিকে কোলের কাছে শুইয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হয়তো বলেছিলেন সেই প্রথম গল্পটা। তারপর সেই গল্প ছড়িয়ে পড়লো মুখে মুখে- এক গল্প থেকে তৈরি হলো আরেক গল্প...কলাবতী রাজকন্যা নাম পালটে হয়ে গেলো কেশবতী...দুধের পাহাড় হয়ে গেলো ক্ষীরের সাগর...সময়ের সাথে সাথে সেই নাতনি হয়ে গেলো দিদিমা, আর সে সেই গল্পটাই আবার শোনালো তার নাতি -পুতিদের। এইভাবেই বেঁচে থাকে যেকোন দেশের উপকথা, লোক কথা আর রূপকথা।

কিন্তু মুখে মুখে ঘুরতে থাকলে তো আর চলবে না! মানুষের জীবন যতো আধুনিক হতে থাকলো, ততই বেড়ে যেতে লাগলো নানারকমের কাজ, কমে যেতে থাকলো এক সঙ্গে বসে গল্পগুজব করার সময়, পড়াশোনার চাপে আর সময় রইলো না নিয়ম করে ঠাকুমা বা দিদিমার কাছে গল্প শোনার। মুখে মুখে যেমন বেঁচে ছিলো অনেক গল্প, না জানি হারিয়ে গেলো আরো কত! তাই একসময়ে এইসব গল্প গুলিকে একত্র করে রাখাটা খুব জরুরি হয়ে পড়লো। বাংলার রূপকথাকে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে চিরদিনের জন্য ঠাঁই দেওয়ার এই কাজটি যিনি নিলেন, তাঁর নাম দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-

১৯৫৭)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ছিলেন শিশুসাহিত্যিক এবং লোককথা সংগ্রাহক। বাংলাদেশের যাবতীয় লোককথাকে তিনি সংগ্রহ করলেন, এবং বাংলা সাহিত্যকে তিনি দিলেন কয়েকটি অমূল্য রতন - ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে এবং ঠানদিদির থলে। এই সংকলনগুলিতে তিনি ভরে দিলেন বাংলাদেশের সেই সব অনাবিল রূপকথা- বুদ্ধু-ভুতুম, সুখু-দুখু, নীলকমল আর লালকমল, ডালিমকুমার, সাত ভাই চম্পা, আরো কতো কতো গল্প। সাথে রইলো বাংলার প্রচলিত হাসির গল্প আর ব্রতকথা।

অন্যান্য রূপকথার গল্পের বইয়ের থেকে দক্ষিণারঞ্জনের লেখার তফাৎ কোথায়? -তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেটি যেন ঠিক সেই ঠাকুমা-দিদিমার মুখের ভাষা। তাঁর লেখাগুলিতে অনেক সময়েই এক শব্দের বারবার ব্যবহার পাওয়া যায়। ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহারও অন্য রকমের। যদি কেউ তাঁর লেখা গল্পগুলিকে ছেদ-যতি এবং শব্দের ব্যবহার মেনে পড়তে পারে, তাহলে ঠিক মনে হবে যেন সেই হাজার বছর আগের দিদিমাই সামনে বসে গল্পটা বলছেন।তাঁর লেখার এই বিশেষ ধরণ নিয়ে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সংকলনের ভূমিকায় প্রশংসা করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই রূপকথার গল্প লেখা ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন আরো নানা রকমের লেখা লিখেছেন ছোটদের জন্য। তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো 'চারু ও হারু' 'উৎপল ও রবি', বাংলার সোনার ছেলে', 'বিজ্ঞানের রূপকথা'।

আজকের দিনে বসে, তোমার কার্টুন নেটওয়ার্ক, ভিডিও গেমস আর হ্যারি পটারের তুলনায় 'ঠাকুরমার ঝুলি' একটু ধীরগতির মনে হতে পারে। কিন্তু কোন দিন যদি সত্যি আর কিচ্ছু ভালো না লাগে, তাহলে হাতে তুলে নাও এই বইটা। তুমি যদি চাও, তাহলে কিন্তু পক্ষিরাজ ঘোড়া তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যাবে যতদূর যেতে চায় তোমার কল্পনার রাশ...

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

পড়ে পাওয়া: কলাবতী রাজকন্যা

সোনার খাটে গা,রূপার খাটে পা রাখিয়া রাজপুরীর মধ্যে, পাঁচ রাণীতে বসিয়া সিঁথিপাটি করিতেছিলেন। এক দাসী আসিয়া খবর দিল, নদীর ঘাটে যে, শুকপঙ্খী নৌকা আসিয়াছে, তাহার রূপার বৈঠা, হীরার হা'ল। নায়ের মধ্যে মেঘ-বরণ চুল কুঁচ-বরণ কন্যা বসিয়া সোনার শুকের সহিত কথা কহিতেছে।

অমনি নদীর ঘাটে পাহারা বসিল; রাণীরা উঠেন-কি-পড়েন, কে আগে কে পাছে; শুকপঙ্খী নায়ে কুঁচ-বরণ কন্যা দেখিতে চলিলেন।

তখন শুকপঙ্খী নায়ে পাল উড়িয়াছে; শুকপঙ্খী তরতর করিয়া ছুটিয়াছে।

রাণীরা বলিলেন-
"কুঁচ - বরণ কন্যা মেঘ-বরণ চুল।
নিয়া যাও কন্যা মোতির ফুল।"

নৌকা হইতে কুঁচ - বরণ কন্যা বলিলেন,-
"মোতির ফুল মোতির ফুল সে বড় দূর,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর পুর।
হাটের সওদা ঢোল -ডগরে, গাছের পাতে ফল।
তিন বুড়ির রাজ্য ছেড়ে রাঙ্গা নদীর জল।"
বলিতে, বলিতে, শুকপঙ্খী নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল।
রাণীরা সকলে বলিলেন -
"কোন দেশের রাজকন্যা কোন দেশে ঘর?
সোনার চাঁদ ছেলে আমার তো-মার বর।"

তখন শুকপঙ্খী আরও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে; কুঁচ-বরণ কন্যা উত্তর করিলেন,-

"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
আনতে পারে মোতির ফুল ঢো-ল-ডগর,
সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।"

শুকপঙ্খী আর দেখা গেল না। রাণীরা অমনি ছেলেদের কাছে খবর পাঠাইলেন। ছেলেরা পক্ষিরাজ ছুটাইয়া বাড়িতে আসিল।

রাজা সকল কথা শুনিয়া ময়ূরপঙ্খী সাজাইতে হুকুম দিলেন। হুকুম দিয়া, রাজা, রাজসভায় দরবার করিতে গেলেন।

শেষ অবধি কোন রাজপুত্র পেলো কুঁচ-বরণ কন্যা কলাবতীকে? কে নিয়ে এলো মোতির ফুল আর ঢোল-ডগর? যদি জানতে চাও, তাহলে এই ছুটিতে পড়ে ফেলো দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা "ঠাকুরমার ঝুলি"।

ঠাকুরমার ঝুলি
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
৮০ টাকা

(মূল বানান অপরিবর্তিত)

দেশে-বিদেশে: সোনালি ঢেউয়ের দেশে

এবারে আমরা এমন একটা জায়গায় যাবো - যেখানে গেলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। শহর থেকে, লোক জনের থেকে অনেক দূরে - যেখানে গাড়ির আওয়াজ নেই, ধোঁয়াও নেই। মাইলের পর মাইল শুধু গাছ, বালি আর পাথর। জায়গাটায় যেতে গেলে হেঁটে যেতে হয়। চার মাইল যাওয়া আর চার মাইল ফিরে আসা- মোট আট মাইল হাঁটতে হবে। শুনে ভয় পেয়ে গেলে নাকি?জায়গাটা অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য আদর্শ। হাতে ম্যাপ, কাঁধে ব্যাগ আর জলের বোতল নিয়ে সাহস করে বেরিয়ে পড়তে হবে।

জায়গাটাড় ছবি দেখো। আমি এর আগে কখনও এরকম কোন জায়গা দেখিনি। ওপরে নীল আকাশ আর নিচে সোনালি পাথরের ঢেউ। হটাৎ দেখলে মনে হবে যেন পৃথিবীর বাইরের কোন অন্য জায়গায় এসে পড়েছি। ভূ-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন যে জায়গাটা ১৯০ মিলিয়ন বা ১৯ কোটি বছরের পুরোনো। একদিন এখানে ডাইনোসর চড়ে বেড়াতো। জায়গাটা ছিলো আদতে বালিয়াড়ী (sand dunes)। তারপর একসময়ে হটাৎ, যেন ম্যাজিকের মতো, বালিয়াড়ী জমে পাথর হয়ে গেলো - হয়তো বা আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য। জায়গাটার নাম ওয়েভ (Wave)। বাংলা করলে দাঁড়ায় ঢেউ। জায়গাটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা আর উটাহা প্রদেশের সীমানায়।

ওয়েভ ফটোগ্রাফারদের কাছে খুব জনপ্রিয়। যারা যায় তারা চোখ ভরে দেখতে আর ছবি তুলতে যায়। এই জায়গাটার ছবি প্রথম বেরোয় জার্মানীর একটা পত্রিকায়। তারপর থেকে ভিড় লেগেই আছে। জায়গাটা বালিপাথর বা স্যান্ডস্টোন এ তৈরি। এই পাথর সহজেই ক্ষয়ে যায় মানুষের পায়ের চাপ লেগে।অ্যারিজোণা সরকার তাই ওয়েভ এ যেতে একদিনে কুড়ি জনের বেশি পর্যটক কে অনুমতি দেয়না। আগে থেকে অনুমতিস জন্য আবেদন করতে হয়। কুড়িজনের বেশি লোক হলেই লটারিতে ঠিক হয় কে যেতে পারবে। তাই আমি আর পিউ ও একদিন সকালে অনুমতি পত্রের জন্য হাজির হলাম অ্যারিজোনার ব্যুরো অফ ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (Bureau of Land Management) এর অফিসে। ওখানেই লটারি হবে আর ঠিক হবে কারা কারা যেতে পারবে, আর কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো না। একটা মজার ঘটনা ঘটলো আর আমি আর পিউ অনুমতি পেয়ে গেলাম। মজার ঘটনাটা বলি।

আমাদের সাথে আরো চোদ্দো জন অপেক্ষা করছে। বুক দুরু দুরু করছে, চিন্তা হচ্ছে যে দশ জনের মধ্যে নাম উঠবে কিনা! ছয় জন হতাশ হয়ে ফিরে যাবে আজ। লটারি হয় বিঙ্গো মেশিনে। মেশিনের ষোলোটা বল আছে, যার ওপরে সংখ্যা লেখা আছে। একজন অফিসার বন বন করে মেশিনটা ঘোড়াতে শুরু করলো। এবার অপেক্ষা কোন সংখ্যাটা ছিটকে বেরিয়ে আসবে!আমাদের সংখ্যা ছয়। বিঙ্গো ঘুরেই চলেছে, কোন সংখ্যা বেরোনোর লক্ষণই নেই। হটাৎ একটা বোল ছিটকে এলো - তার সংখ্যা তিন - চারজনের একটা দল সুযোগ পেয়ে গেলো। তারপর একটা দুইজনের দল। আমাদের বুক ধড়ফড় করছে। আমি প্রাণপণে ঠাকুরের নাম করছি। পরে পিউ আমাকে বললো যে পিউও জোরে জোরে ঠাকুর নাম করছিলো। নাম না উঠলে এতদূর আসা ব্যর্থ হবে। বিঙ্গো মেশিনের চাকা ঘুরেই চলেছে। হটাৎ একটা ঘটনা ঘটলো যার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। একটা বল ঠকাস করে লাফিয়ে ছিটকে বাইরে পড়ে গেলো। যে গর্তটা দিয়ে বেরোয় সেখান দিয়ে নয় কিন্তু, অন্য কোন একটা জায়গা দিয়ে। পিউ আমার হাত চেপে ধরে আছে। উত্তেজনায় এতো জোরে চেপে ধরেছে যে রীতিমত লাগছে। কেউ একজন মেঝে থেকে বলটা কুড়িয়ে দিলো। ঘোষক বলের সংখ্যা দেখে ঘোষণা করলেন- ছয়! ছয়!- আরে, সেটা তো আমাদের সংখ্যা। আমার বুকটা একবার জোরে ধক করে উঠলো। আ-হা-হা-হা! কি আনন্দ! আমি আর পিউ শেষ পর্যন্ত ওয়েভ দেখতে যাচ্ছি। বাকি সময় গেলো পারমিট, ম্যাপ, এসব নিতে। সবকিছু করতে করতে বেলা দুপুর হলো। আমরা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরে গেলাম। আগামিকালের জন্য তৈরি হতে হবে। বিশেষতঃ, রাস্তায় জল নেই, তাই আমাদের অবশ্যই অনেক জল নিয়ে যেতে হবে।

জায়গাটায় যাওয়ার জন্য কোন রাস্তা করা নেই। ম্যাপ, কম্পাস এবং/অথবা জি পি এস আবশ্যক। তবে আমাদের আগে এতো লোক গেছে যে বালির ওপর পায়ের ছাপে ভরা। কিছু কিছু জায়গায় মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। সেইসব জায়গাগুলিতে ম্যাপ আবশ্যক। এই পাথর এতো মসৃণ যে পা ফস্কে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে সব সময়। এই পাথরগুলোকে বলে স্লিকরক (slick rock)। তাই এই জায়গায় চলার জন্য এমন জুতোর দরকার যেটা সহজে পিছলে যাবে না। আর যেসব জায়গায় পায়ের ছাপ নেই, সেখানে ম্যাপই ভরসা। আর তার সাথে সব সময় চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।সমসময় খেয়াল রাখতে হবে ল্যান্ডমার্ক গুলির দিকে। আমাদের ল্যান্ডমার্ক ছিলো দুটো জিনিষ - টুইন বাট (Twin Butte) আর নচ(Notch)।

টুইন বাট

নচএর ঠিক নিচেই আছে ওয়েভ। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর নচ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা ওই নচ বরাবর চললাম।

নচ

আমরা প্রায় তিন ঘন্টা ধরে হাঁটছি। রাস্তায় আর কাউকে দেখতে পাইনি। সূর্য আসতে আসতে ওপরে উঠছে। সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। এমন সময় রাস্তায় দেখতে পেলাম এক ডেসার্ট লিজার্ড কে।

ডেসার্ট লিজার্ড

আমাদের পেছন দিকে দেখলে মনে হবে পাহাড়ে মাছের কাঁটা সাজানো আছে। এগুলো একসময়ে জলের তলায় ছিলো। জলের তলায় পলি জমে জমে একসময়ে পাথর হয়ে গেছে। এই পাথরগুলিকে দেখলে মনে হয় পেঁয়াজের খোসার মতো জমে আছে। এই পাথরগুলি হলো স্যান্ডস্টোন। ভূ-বিজ্ঞানীরা এই পাথরগুলিকে দেখে বলতে পারেন যে সময়ে এই পাথর তৈরি হয়েছে, সেই সময়ে জলের স্রোত কোনদিকে ছিলো, হাওয়া কত জোরে বইতো।

মাছের কাঁটার মত পাথর

এতক্ষণে আমরা ওয়েভ এর কাছাকাছি এসে গেছি। সামনে ডান দিকে বাঁক নিয়ে কুড়ি ফুট মতো উঠতে হবে। কুড়ি ফুট চড়তেই সামনে অসাধারণ দৃশ্য! আমরা এসে গেছি ওয়েভ এ। গিয়ে দেখতে পেলাম আরো অনেকে আমাদের আগে এসে গেছে আর ছবি তোলা শুরু করে দিয়েছে। নিচের ছবিতে একজন ভাবছে কিভাবে ছবি তুললে ভালো লাগবে।

এই যে ব্যান্ডগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলি হাজার হাজার বছর ধরে পলি জমে পরে তৈরি হয়েছে।জলে লোহার পরিমাণের ওপর নির্ভহর করে পাথরের রঙ হয়। কাছের থেকে ব্যান্ড গুলো এইরকম দেখায়।

অনেক সময়ে পলি বিভিন্ন আকারে জমা হতে পারে। এই জায়গায় পলি জমে ঠিক যেন এক আইসক্রিমের কোন তৈরি হয়েছে।

এছাড়া আছে যেগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে। অন্য দিকে গেলে দেখা যাবে স্যান্ডস্টোন জমে যাওয়ার পর আর কি কি ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছে এই জায়াগায়।
নিচের ছবিটায় z – আকারটা দেখো। খেয়াল করলে দেখবে আকারটা ফাটা ফাটা।

বা এই ছবিটা- ভাবতে অবাক লাগে কি কি রকমের ভৌগোলিক পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে এই জায়গাটায়।

এইরকম জায়গায় কিছুক্ষণ থাকলে মনে হবে প্রকৃতি কত বড়ো শিল্পী - এ যেন এক বিশাল শিল্পকর্ম, যা প্রকৃতি চুপচাপ বানিয়ে রেখেছিলেন আমরা দেখবো বলে।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হতে চললো। আমাদের সামনে আবার তিন-চার ঘন্টা হাঁটা আছে। দিন থাকতে থাকতে ফিরতে হবে। আমাদের উঠতে ইচ্ছা করছিলো না। কিন্তু সন্ধ্যে হওয়ার আগেই ফিরতে হবে। এখানে রাস্তায় আলো নেই। রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক। বেরিয়ে আসার আগে শেষ একটা ছবি তুলে নিলাম।

দেখে ঠিক মনে হচ্ছে না, যে কমলা-সোনালি ঢেউয়ের ওপর ভেসে যাচ্ছি?

ব্যস, মজা শেষ। আবার হাঁটা শুরু।প্রায় তিন ঘন্টা পর আমরা এসে গেলাম গাড়ি রাখার জায়গায়। এই জায়গাটা মনের মধ্যে গেঁথে থাকবে। আবার ইচ্ছে রইলো এখানে আসার। শুনেছি বরফ পড়লে জায়গাটা খুব সুন্দর লাগে। পরের বার ঠাণ্ডার সময়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। এদিকে তো সেপ্টেম্বর পড়ে গেলো। অক্টোবর এ যাবো মনার্ক প্রজাপতিদের পরিযানের ছবি তুলতে। তোমাকে জানাবো প্রজাপতিদের ছবি তুলতে পারলাম কি না।

লেখা ও ছবিঃ
দেবাশীষ পাল
ওকলাহোমা সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছবির খবর: হীরের আংটি

মহালয়ার দিন ভোরবেলা, যখন আকাশবানীর "মহিষাসুরমর্দিনী" প্রায় শেষ হওয়ার মুখে, তখন মায়ের ডাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য হল হাবুল। এই ক'টা দিন হাবুলের খুব মজা। বাড়িতে দুর্গাপুজো হবে, নাটমন্দিরে ঠাকুর গড়া হচ্ছে।

ঠাকুর গড়া হচ্ছে

বাবা আর কাকু সন্ধালবেলায় বেরিয়ে গেলেন ঠাকুরের সাজ-সজ্জা কিনতে। ঢাকিরাও এসে গেলো ঢ্যাম কুর কুর বাজনা বাজাতে বাজাতে। হাবুলের অনেক কাজ- দাদু দায়িত্ব দিয়েছেন নাটমন্দির সাজাতে। ওদিকে আবার সবাইকে অবাক করে দিয়ে সপ্তমীর বদলে মহালয়ার সকালেই আমেরিকা থেকে হাজির মেজোকাকু, কাকী আর তিন্নি। এইরকম জমজমাট অবস্থার মধ্যে বাড়িতে এসে উপস্থিত হল এক নতুন অতিথি। সুন্দর, হাসিখুশি, সুবেশ এই মানুষটি, যার নাম কিনা গন্ধর্বকুমার, যে কিনা কোন এক দূর

দেশের রাজপুত্র, তাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেলো হাবুলের। হবে না? কি দারুণ ঢাক বাজাতে পারে, কি অনায়াসে সব রঙিন কাগজ কেটে এক মুহূর্তে হাবুলকে নাটমন্দির সাজানোর জন্য পাখি, রথ বানিয়ে দিলো! আবার ঘোড়ায়ও চড়তে পারে, এমনকি ম্যাজিক ও জানে! কিছুক্ষণের মধ্যেই তো গন্ধর্বকুমার হয়ে গেলো হাবুলের গেনুদা।

গেনুদা আর হাবুল

তিন্নি আর হাবুল

এদিকে গন্ধর্বকুমারের আসার খবর পেয়েই দাদু খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে ঘরের ভেতর খিল দিলেন। কি কথাবার্তা হলো কে জানে! আর ওদিকে আবার ষষ্ঠী চোর আর গুপী স্যাকরা দুজনে মিলে মতলব আঁটছে গন্ধর্বকুমারের হাতের হীরের আঙটিটাকে হাতাবার; ষষ্ঠীর অনেকদিনের শখ একটা

ডাকাতের দল খুলবে, ওই আঙটি একবার হাতাতে পারলেই কেল্লা ফতে!

গুপী স্যাকরা আর ষষ্ঠী চোর

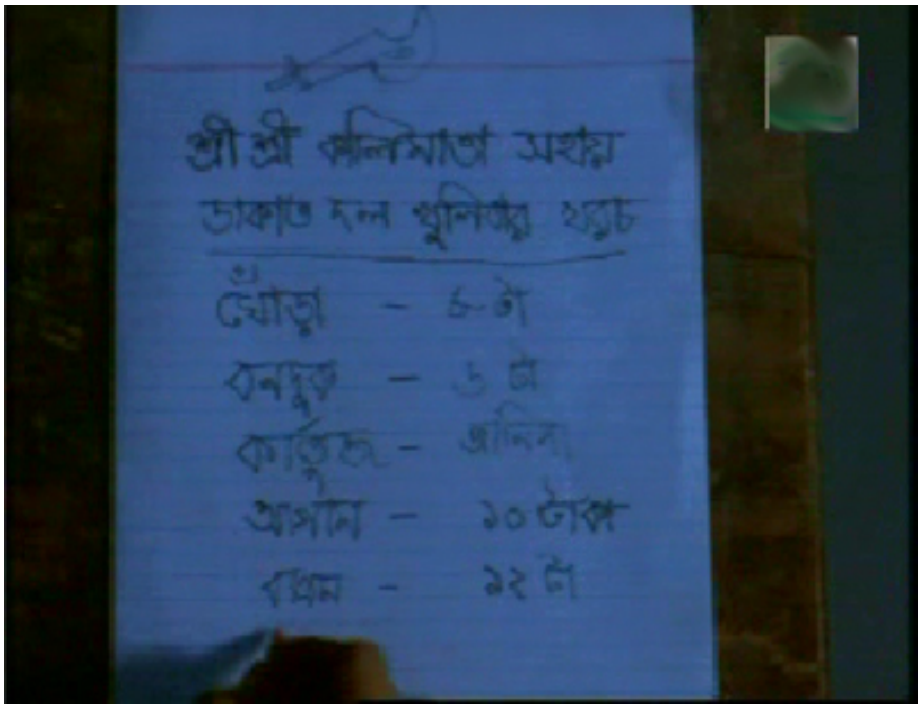

ডাকাত দল খোলার ফর্দ

সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে এসে হাবুল আর তিন্নি দেখল নাটমন্দিরে আলো নেভানো। দাদু পুজো বন্ধ করে দিতে বলেছেন!কিন্তু কেন? গন্ধর্বকুমার কে? বাড়ির সবাই এতো গম্ভীর কেনো? রাতের

অন্ধকারে দাদুর সঙ্গে কে দেখা করতে এলো?

দাদু আর পাঁচুদা

গল্পের শেষটা জানতে হলে দেখতে হবে চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির প্রযোজনায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর লেখা রহস্যের জমজমাট গল্প নিয়ে ১৯৯২ সালে তৈরি ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি "হীরের আঙটি"। এই ছবির পটভূমিকায় রয়েছে দুর্গাপুজো - বর্ষা শেষের নীল আকাশ, কচি ধানে ভরা সবুজ মাঠ, শাপলা ভরা বিল, নাটমন্দিরে মাটির মূর্তির গায়ে তুলির টান, ঢাকের বাদ্যি... আর ছবির শুরুতে "মহিষাসুরমর্দিনী"র মনভোলানো গানের সুর। সাথে অনবদ্য অভিনয় বসন্ত চৌধুরি, সুমন্ত মুখার্জী, সুনীল মুখার্জী,জ্ঞ্যানেশ মুখার্জী, দুলাল লাহিড়ী আর অয়ন ব্যানার্জী সহ অন্যান্য আরো শিল্পীদের। আর সন্দীপন মজুমদার (হাবুল), অঙ্কিতা দত্ত (তিন্নি) আর শুভ্রদীপ দে (ঢাকির ছেলে) তো দারুণ অভিনয় করেইছে। পুজোর ছুটির মধ্যে একদিন সময় করে না হয় দেখেই ফেলো এই ছবিটা।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

বায়োস্কোপের বারোকথা: হাসি কান্নার জাদুকর

পর্ব পাঁচ

সিনেমা গ্রিফিথের পরে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। আমেরিকার হাটে-বাজারে লোকালয়ে তার দাপট দেখা দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সিনেমা তৈরির ব্যাপারটাকে একটু একটু করে একটা নিয়মের মধ্যে এনে ফেলা। এর জন্য তৈরি হয়েছিলো স্টুডিও ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কাজকর্ম হতো প্রায় অফিসের মতো। প্রতিটি স্টুডিও তে থাকতো মাইনে করা অভিনেতা-অভিনেত্রি, পরিচালক এবং অন্যান্য কলাকুশলী। সবাই নিয়ম করে সকাল থেকে সন্ধ্যা স্টুডিও তে কাজ করতো।

যাঁরা এই কাজটা করছিলেন তাঁরা একই সঙ্গে বুঝতে পারছিলেন যে হাসি ঠাট্টা রঙ্গতামাশা মানুষের বেঁচে থাকার, বিশেষ করে তলার দিকে মানুষের জীবনধারার রসদ। হাসি আর মজা দিয়েই মানুষ নিজের জীবনের সব দুঃখ ভুলে থাকে। তাই আমরা ক্রমশঃ দেখতে পেলাম যে কারখানার মতো কতগুলি নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেই নির্বাক যুগে গড়ে উঠলো নির্বাক কৌতুক বা কমেডি ছবির (silent comedy) একটি ধারা।

এই ধারার শুরু হয়েছিলো ম্যাক সেনেট নামের এক ছবি নির্মাতার হাত ধরে।সেনেটের ছবিগুলি ছিলো এক রিল বা দুই রিলের কমেডি। এগুলিকে বলা হয় স্ল্যাপস্টিক কমেডি। এই কমেডিতে গল্প খুব একটা জরুরি ছিলো না। এই ছবিগুলি তৈরি হতো খানিক সার্কাস, খানিক ভানুমতীর খেলা, খানিক মূকাভিনয় আর একটু ভাঁড়ামি নিয়ে। এইসব মিলে মিশে সেযুগের মার্কিন দেশের খানিকটা এলোমেলো চেহারা চোখে এনে দিতো হাসির ফোয়ারা। এই ম্যাক সেনেট ই প্রযোজনা করেছিলেন চ্যাপলিনের প্রথম ছবি। শুধু তাই নয়, চ্যাপলিন ছাড়াও বাস্টার কীটন, হ্যারি ল্যাংডন - এইসব বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতাদের জন্য তিনিই খুলে দিয়েছিলেন সাফল্যের দরজা।

ম্যাক সেনেট

নির্বাক মার্কিন যুগের সবচেয়ে বড় প্রতিভা হলেন চার্লি চ্যাপলিন, সেই ছোট্ট ভাঁড় যিনি হাসি দিয়ে সসাগরা পৃথিবীকে শাসণ করেন। কি করেছিলেন চ্যাপলিন? - দ্য কিড, গোল্ড রাশ, মডার্ন টাইমস, লাইমলাইট বা দ্য গ্রেট ডিক্টেটর - সব ছবিতেই তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন, অন্ধকার রাস্তার কোন থেকে উঠে এসে রাজপুত্তুর হয়ে ওঠার গল্প। তাঁর বিখ্যাত 'ভবঘুরে' বা Little Tramp সাজে চ্যাপলিন ছিলেন পৃথিবীর অগনিত দুর্বল, গরিব, নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি।

চার্লি চ্যাপলিন

তাঁর 'ভবঘুরে' সাজকে ভালোবেসে ফেলেছিলো সবাই। ঢোলা পাৎলুন, চাপা কোট, দু পায়ে দুই মাপের জুতো, মাথায় ডার্বি টুপি, হাতে বেতের ছড়ি আর সেই বিখ্যাত টুথব্রাশ গোঁফ নিয়ে সেই ভবঘুরে হারিয়ে দিতে পারতো সমস্ত শাসকদের -তা সে পুলিশই হোক, বড়লোকই হোক, বা হোক রাষ্ট্রনায়ক। সত্যি বলতে কি, উপন্যাসে চার্লস ডিকেন্স যে কাজটা করেছেন, সিনেমায় চার্লি চ্যাপলিন সেই কাজটাই করেন।

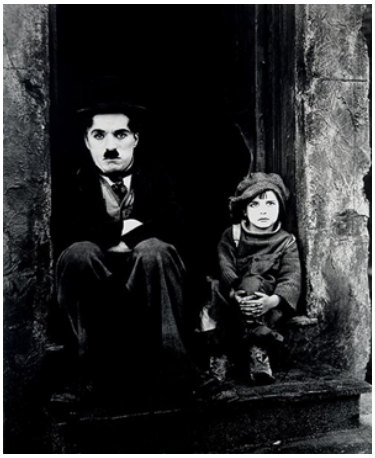

দ্য কিড ছবিতে চ্যাপলিন ও শিশুশিল্পী

সে যুগের আমেরিকায় টাকার ঝনৎকারের মধ্যে যে কান্না লুকিয়ে ছিলো, আলোর পেছনে যে অন্ধকার, সেই কান্না, সেই অন্ধকারের গল্প বলার সময় চ্যাপলিন কিন্তু বড় বড় কথা বলেন না, বরং হাসেন এবং হাসান। এবং হাসতে হাসতেই কঠোর সমালোচনা করেন সমাজের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যেমন দ্য গ্রেট ডিক্টেটর ছবিতে তিনি বলেন - "যদি একটি মানুষকে মারো, তবে তুমি খুনি। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারো তবে তুমি বীর। সংখ্যাই পবিত্র করে।" এই কথা শোনার পর এই যুদ্ধ আর রক্তে ভরা পৃথিবীতে আমরা সবাই সিনেমাকে অন্য ভাবে দেখি।

অবশ্য চ্যাপলিন একলা ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পথ হেঁটেছেন বাস্টার কীটন - সেযুগের আরেকজন প্রতিভাবান অভিনেতা এবং চলচ্চিত্রকার। তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন কত ভালো করে ইতিহাসকে দেখানো যায়, শরীরের ভাষা দিয়ে কি করে কথা বলা যায়। তাঁর 'আওয়ার হসপিটালিটি' এবং 'দ্য জেনরল' খুব লঘুস্বরে মার্কিন ইতিহাসের হিংসা ও রক্তপাতের দিকে মন্তব্য করে। কীটনের ছবিতেও হাসির পেছনে লুকিয়ে থাকে চাপা হাহাকার।

বাস্টার কীটন

এছাড়াও যদি আমরা আর কারোর নাম করি তাহলে হ্যারল্ড লয়েড এর কথা বলতে হবে, যিনি সিনেমায় নিজের দৈহিক বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়ে হলের মধ্যে হাসির বন্যা বইয়ে দিতে পারতেন। এছাড়া ছিলেন ফ্যাটি আরবাকল্, যিনি চ্যাপলিন, কীটন প্রমুখের সমসাময়িক ছিলেন।

হ্যারল্ড লয়েড

ফ্যাটি আরবাকল্

আর ছিলেন মার্ক্স ব্রাদার্স -চিকো, হারপো আর গ্রুচো - এই তিন ভাইয়ের কৌতুক ছবিগুলিকে প্রথম একশোটা নির্বাক কমেডি ছবির মধ্যে গন্য করা হয়।

মার্ক্স ব্রাদার্স

তবে সব ছোটরাই বোধ হয় সব থেকে খুশি হবে, যদি লরেল আর হার্ডির কথা বলা হয়। লরেল ও চ্যাপলিনের মতোই ভ্রাম্যমাণ নাটকের দলের সঙ্গে আমেরিকায় এসেছিলেন; আর হার্ডি ছিলেন জর্জিয়ার লোক। পরে তাঁরা জুটি বাঁধেন। দুজনে মিলে একসঙ্গে ১০৬ টি ছবিতে কাজ করেন। রোগা লরেল আর মোটা হার্ডি হয়ে ওঠেন এক জনপ্রিয় জুটি। বলা যেতে পারে, লরেল-হার্ডি হয়ে ওঠেন চলচ্চিত্রের হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন।

লরেল আর হার্ডি

সিনেমাকে যদি সাধারণ মানুষের শিল্প বলি, যদি বলি সিনেমা সমাজের আয়না, তাহলে আমেরিকান নির্বাক কমেডি যুগের গুরুত্ব এই যে এই যুগে হাসি, ঠাট্টা,রঙ্গ, কৌতুকের মধ্যে দিয়ে সিনেমা সত্যি করে হয়ে উঠলো সাধারণ মাণুষের জীবনযুদ্ধের কথা বলার মাধ্যম। আমাদের পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কতটা জরুরি, হোঁচট খেলে কতটা ব্যথা লাগে, কেমন করে মুছিয়ে দিতে হয় অসহায় মানুষের চোখের জল, এ কি আমরা চার্লি চ্যাপলিনের ছবি না দেখলে জানতে পারতাম?

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি
উইকিপিডিয়া

পরশমণি: রান্নাঘরে আরেকবার

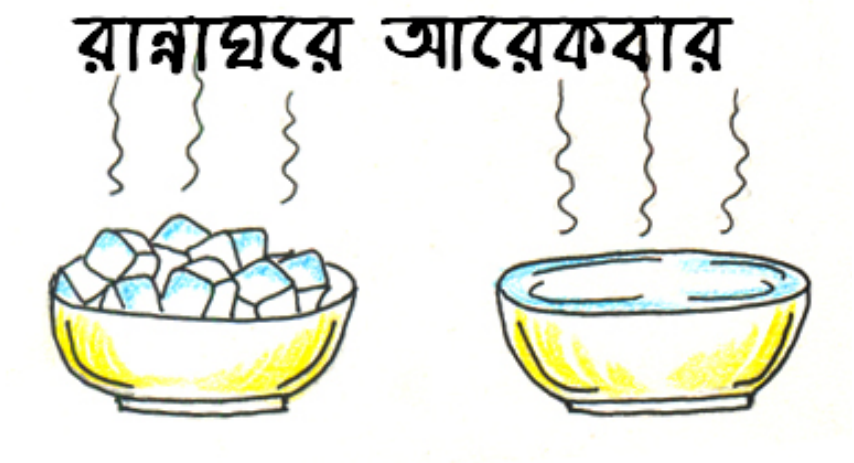

কি, পুজো তো এসে গেল...আর সামনে তো বেশ কয়েকদিন ছুটি, তাই না? নাকি তোমার স্কুলে এখনই ছুটি পড়ে গেছে? অনেক সময়, আর হোমটাস্ক ও সব শেষ? হাতের কাছে করার মত কিছু পাচ্ছ না, তাই কি? কি করা যায় বল দেখি?

আচ্ছা চল। আরেকবার রান্নাঘরে যাই। ওখানে গেলেই কিছু একটা পেয়ে যাবে করার মত। মা'কে বলে কয়ে আধ স্যসপ্যান জল ফুটিয়ে নিতে পারবে? একটু আবদার করলে মা রাজি হয়ে যাবেন মনে হয়।

মা যতক্ষন জল ফোটাচ্ছেন, ততক্ষনে তুমি একটা কাজ করে ফেলতে পারো। রেফ্রিজারেটরের ডীপ ফ্রিজ থেকে এক ট্রে বরফ বের করে বরফের টুকরোগুলি একটা বাটিতে করে টেবলে রাখো। এবার মাকে বল গরম জলের পাত্রটা এনে বরফের বাটির পাশে রাখতে।

ভালো করে পরখ করতো কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা! পাচ্ছে কি? আরে, দুটো পাত্র থেকেই তো ধোঁয়া উঠছে, তাই না! ধোঁয়া বললাম বটে, চলতি কথায় তাই বলে থাকি আমরা, যদিও মোটেই ধোঁয়া নয়। ধোঁয়ার মত দেখতে ওটা কি সেটা পরে বলছি।

তার আগে একটু ভাবার ব্যপার রয়েছে। একটা গরম, আর একটা ঠান্ডা, দুটো পাত্র থেকে একই রকমভাবেই ধোঁয়ার মত উঠছে। ব্যপারটাতে একটু অবাক হচ্ছো না? আসলে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই। বললেই বুঝবে যে ব্যপারটা কত সহজ।

জলীয় বাষ্প কাকে বলে জানো বোধ হয়। তাহলেও সংক্ষেপে একটু বলি। যেকোন পদার্থ তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে, যেমন কঠিন অবস্থা, তরল অবস্থা এবং গ্যাসীয় বা বায়বীয় অবস্থা। বরফ তো কঠিন। একে তাপ দিলে তরল জলে পরিণত হয়। আবার জল কে তাপ দিলে জলীয় বাষ্পে (জলের বায়বীয় অবস্থা) পরিণত হয়।

আমরা এই জলীয় বাষ্পকে দেখতে পাইনা। জলীয় বাষ্প দেখতে পেলে আমাদের চারপাশের বাতাসকে সব সময় ধোঁয়াটে দেখাতো। পরিষ্কার ভাবে কিছুই দেখতে পেতাম না, কেননা বাতাসে সব সময় কিছুটা জলীয় বাষ্প থাকেই। প্রমান চাই? তাহলে এই সহজ পরীক্ষাটা করে দেখ।

বাইরেটা শুকনো এমন একটা কাঁচের গ্লাসে দু'এক টুকরো বরফ সহ কিছুটা জল রাখো, দেখো যেন, এটা করতে গিয়ে বাইরের দিকটা ভিজে না যায়। দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের বাইরের দিকটা ঘোলাটে হয়ে উঠলো এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে বিন্দু বিন্দু জল জমতে শুরু করলো। এর কারণ কি হতে পারে? বাতাসে যে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প ছিল সেটা ঠাণ্ডা গ্লাসের ছোঁয়ায় জমে জল হয়ে গ্লাসের গায়ে লেগে বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হচ্ছে। বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে সেটা এভাবেই প্রমাণ হলো।

এবার আমাদের টেবলে রাখা বরফের কথায় আসি। বাতাস তো সব জায়গাতেই থাকে। তাই বরফের পাশেও রয়েছে আর তাতে অদৃশ্য জলীয় বাষ্পও রয়েছে। সেই বাতাস যখন বরফের কাছে এসে ঠান্ডা হচ্ছে, তখন তাতে থাকা বাষ্পও ঠান্ডা হয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই জলকণাগুলোই আমাদের কাছে ধোঁয়ার মত লাগছে। আমাদের মনে ধন্দ জাগাচ্ছে যেন বরফের ধোঁয়া হচ্ছে।

আর গরম জলের ব্যপারটা তাহলে কি? সেটাও একই রকম ব্যপার। গরম জল থেকে যে বাষ্পটা উঠছে সেটা দেখতে পাওয়ার কথা নয়। গরম বাষ্পটা কিছুটা উঠে চারপাশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় (স্যসপ্যানের জলের থেকে ঠাণ্ডা) এসে জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। তাই ধোঁয়ার মত লাগছে।

তাহলে দুটি অবস্থার পার্থক্য বুঝলেতো? গোলমালটা কাটলো তো

****

ডীপ ফ্রিজ থেকে যখন বরফের ট্রে টা বার করছিলে তখন হাতে কিছু টের পেয়েছিলে? ট্রে টা চটচটে লাগেনি?মনে হচ্ছিল না, যে ওটার গায়ে আঠা লাগানো আছে?কেন মনে হচ্ছিল বলতে পারবে? আমি বলে দিচ্ছি। বরফের ট্রে-এর বাইরের দিকে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ লেগে থাকে। কখনও খেয়াল করেছো? আর একটা ব্যপার কখনও খেয়াল করেছ কি যে আমাদের হাতটাতে সর্বদাই একটা ভিজে ভিজে ভাব থাকে। অনেকের তো এমনও হয় বেশিক্ষণ কলম বা পেন্সিল ধরে লিখতে পারে না, সেগুলি এতটাই ভিজে যায় যে হাত থেকে পিছলেও যায় অনেক সময়।

ট্রে-কে হাত দিয়ে ধরলে ঠাণ্ডা বরফের কণার স্পর্শে হাতের জল জমে যায়। আর হাতের আঙুলের চাপের ফলে হাতের জমে যাওয়া জল বরফ কণার গায়ে আটকে যায় আঠার মত। তাই হাত ছাড়াতে গেলে একটু টেনে ধরে।

যেখানে জল বেশী সেখানে এই টানটা অনেক বেশী হয়। যদি ট্রে -এর গায়ে ঠোঁট বা বিশেষ করে জিভ ঠেকাও, তাহলে বিপদ হতে পারে।কেননা জিভে বেশী জল থাকায় বেশী বরফ হয়ে টানটা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে কিন্তু জিভ ছাড়াবার সময়ে জিভের ওপরের স্তরটা ছড়ে যেতে পারে।

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

জানা-অজানা: মারথোমা নাসরানিদের দেশে

তুমি তো নিশ্চয়ই 'কেরল' বা 'কেরালা'র নাম শুনেছো -দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক আর তামিলণাড়ু সংলগ্ন যে ছোট্ট একটা রাজ্য, যেখানে সবাই "মলয়ালম" ভাষায় কথা বলে? প্রায় বছর ষাটেক আগে ঐ অঞ্চলের ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিন - এই দুটো ছোট রাজ্য মিলে বর্তমান কেরলের জন্ম হয়, কারণ ওই দুটো অঞ্চলেই সমস্ত মানুষ এই মলয়ালম ভাষায় কথা বলতো।

পূর্দ্দিকে সুদীর্ঘ বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা আর পশ্চিমে বিশাল সমুদ্র কেরল ভূখন্ডকে পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলো থেকে এমনভাবে লুকিয়ে আড়াল করে রেখেছে, যে বহু শতাব্দী ধরে মানুষজন এর অস্তিত্বের কথাই জানতো না। কিন্তু দেশের মানুষ না জানুক, বাইরের সুবিশাল জগতের সঙ্গে-বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে কেরলের ছিলো সুপ্রাচীণ বানিজ্যিক সম্পর্ক - আর সেই সূত্রেই বহু দেশের হরেক রকম সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের যাতায়াত ছিলো এই কেরলে, যাদের মধ্যে অনেকেই এখানে পাকাপাকিভাবে আস্তানাও গেড়েছিলো।

ব্যাকওয়াটার -কোট্টায়ম থেকে আলেপ্পি যাওয়ার পথে

এই যে ব্যাকওয়াটারের ছবি দেখছো, এগুলো হলো সমুদ্রেরই অংশ যা খাঁড়ির মতো মূল ভূখন্ডের অনেক ঢুকে গেছে। ভাবতে পারো, এর ওপর দিয়েই চলাচল করতো হাজার হাজার বছর আগের বহুদূর থেকে আসা সমস্ত বণিকদের জাহাজ-বজরা?কেরলে এই প্রবল বাণিজ্যিক আকর্ষণের অন্যতম মূল কারণ ছিল 'গোলমরিচ', যা সেই সময়ে ইউরোপে রপ্তানি করা হতো- এই গোলমরিচ পশ্চিমে পরিচিত ছিলো 'ব্ল্যাক গোল্ড' অর্থাৎ 'কৃষ্ণকায় স্বর্ণ' নামে। তাহলেই বুঝে দেখো, এর কদর! আর তার চেয়েও বড় কথা হলো এই যে এই প্রকান্ড বাণিজ্য কুক্ষিগত ছিলো কেরলের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে, যারা হলো আমাদের আলোচনার মূল বিষয়।

ব্যাকওয়াটারের ধারে মানুষের বসতি; প্রত্যেক বাড়ির নিজস্ব ঘাট ও নৌকা আছে

প্রাচীনকাল থেকেই আরা পরিচিত সাধু থোমার খ্রীষ্টিয়ান নামে। এরাই আবার সিরিয়ান বা সুরীয় খ্রীষ্টিয়ান নামেও পরিচিত, কারণ এরা এখনও সিরিয়্যাক ভাষায় উপাসনা করে থাকে - যে ভাষায় কথা বলতেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট।যীশু খ্রীষ্টের বারোজন শিষ্যের অন্যতম সাধু থোমা বা সেন্ট টমাস প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (আনুমানিক ৫২ খ্রীষ্টাব্দে) কেরল উপকূলে উপস্থিত হন এবং তাঁর প্রচার ও আশ্চর্য কাজে মুগ্ধ হয়ে বহু মানুষ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় - এরাই হলো কেরলের সুরীয় খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়। আমাদের দেশের বহু বিখ্যাত মনীষীই এই সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। সেন্ট টমাসের কেরলে আগমনকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আছে বহু প্রাচীণ উপাখ্যান, পুরাণ -কথা ও বিভিন্ন গীতিমাল্য, নাচ - যা সবই হলো কেরল তথা ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের সুমহান ঐতিহ্যের শরিক। এওসব নিয়ে আমরা পরে সুযোগ পেলে আলোচনা করবো।

প্রথমেই বলেছি যে সেই কত হাজার বছর আগে থেকেই কেরলে কত বিচিত্র জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ এসেছে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে। তাই বহু প্রাচীন কাল থেকেই এখানে যেমন ছিলো স্থানীয় হিন্দু মন্দির, তেমনি সুরীয় খ্রীষ্টানদের গীর্জা, ইহুদী সিনাগগ, মুসলমানদের মসজিদ, বৌদ্ধদের প্যাগোডা, এমনকি গ্রীক ও রোমানদের মন্দির! বেশ কিছু বছর আগেই কেরলের সমুদ্র উপকূলে খননকার্য চালিয়ে প্রত্নতাত্বিকেরা খুঁজে পেয়েছেন একটি বিশালকায় গ্রীক দেবতা আপোল্লোর মন্দির! তাই বহুযুগ ধরেই কেরলে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক সমন্বয় ও আদান-প্রদান ভিত্তিক সম্পর্ক দেখা গেছে তার

সত্যিই জুরি মেলা ভার। অনেক সময় দেখা যায়,কেরলের মন্দির ও প্রাচীন গীর্জাগুলি একই রকম পাথরে তৈরি আর অবিকল এক দেখতে। কারণ হলো, একই স্থপতি সব কিছু তৈরি করতো।

কোট্টায়মের প্রাচীন গীর্জা; পাশেই উঁকি দিচ্ছে মসজিদের মিনার

ছবিতে তুমি দেখতে পাচ্ছো যে কোট্টায়মে (মধ্য কেরালায়) একই স্থানে সিরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান গির্জা (কমপক্ষে ১০০০-১২০০ বছর প্রাচীন), হিন্দু মন্দির ও মুসলিম মসজিদ। উত্তর কেরালার পালায়ুরে গেলে দেখবে একই চাতালের মধ্যে রয়েছে প্রাচীণ মন্দির, গির্জা,মসজিদ ও ইহুদীদের সিনাগগ। এখনও বিশেষ বিশেষ উৎসব বা পর্বদিনে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিভিন্ন আচারের আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

কোচিনে প্রাচীন মন্দির; পাশেই রয়েছে ইহুদীদের সিনাগগ; চূড়া দেখা যাচ্ছে

সিরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান গীর্জার সামনে গোপুরম বা পতাকাস্তম্ভ; প্রতিটি মন্দিরের সামনেও থাকে। পর্বদিনে পতাকা উত্তোলন করা হয়।

কেরলের এই প্রাচীণ খ্রীষ্টিয়ানেরা নিজেদের মলয়ালম ভাষায় বলে থাকে 'মারথোমা নাসরানিঙ্গল' বা 'মারথোমা নাসরানি'। সিরিয়্যাক ভাষায় 'মার' মানে প্রভু বা সন্ত আর 'নাসরানি' হলো আরবী শব্দ যার মানে খ্রীষ্টিয়ান, কারণ যীশু খ্রীষ্টের পৈতৃক ভিটে ছিলো 'নাসরৎ' নামক গ্রামে। অর্থাৎ এরা নিজেদের 'সাধু থোমার খ্রীষ্টিয়ান'- এই নামে অভিহিত করে। তাই সাধু থোমা বা সেন্ট টমাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করে রয়েছেন - যেন এক রূপকথার চরিত্র। সেন্ট টমাস, যিনি তাদের পূর্বপুরুষদের দীক্ষা দিয়েছিলেন দুহাজার বছর আগে, তাদের কাছে কোন নিছক প্রবাদবাক্য নয়। সিরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের প্রতিটি শিশুই আম, নারকোল, বাগদা চিংড়ি আর নানারকম মসলার স্বাদ-গন্ধের মতোই সেন্ট টমাসের কাহিনী তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করতে করতেই বেড়ে ওঠে।

চেঙ্গান্নুরে প্রাচীন সিরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান গীর্জা; বলা হয়, ১৭০০ বছরের পুরোনো,অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত

গীর্জার সামনে প্রাচীন গ্র্যানাইট ক্রুশ; গায়ে রয়েছে খোদাই করা পশু, পাখি, মানুষ, নক্সা

ফাদার ভার্গিজ, একজন সিরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান মালপান (সিরিয়্যাক ভাষার শিক্ষক)-এর সাথে আমি

কথিত আছে, কেরলদেশের সাতটি স্থানে সাধু থোমা স্থাপন করেছিলেন পবিত্র ক্রুশ –পরবর্তীকালে যেখানে গড়ে ওঠে সাতটি গির্জা। এইগুলো হলো যথাক্রমে – কোড্ডুঙ্গাল্লুর (বা ক্রাঙ্গানোর), কোল্লাম, পালায়ুর, পারুর, নিরানাম, কোক্কমংগলম আর চায়াল। সিরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান রা ছড়িয়ে আছেন সমগ্র কেরল জুড়ে, বিশেষ করে মধ্য ও দক্ষিণ কেরালায়। পরের সংখ্যায় আমরা এইরকম বিভিন্ন জায়গায় ও প্রাচীণ পীঠস্থানে যাবো, অনেক ছবি দেখবো আর আরও অনেক চমকপ্রদ বিষয়ে কথা শুনবো। আমাদের যাত্রা শুরু হবে মধ্য কেরালার সিরিয়ান খ্রীষ্টান অধ্যুষিত ছোট্ট শহর কোট্টায়াম থেকে।

(ক্রমশঃ)

আবীরলাল মিত্র
মানিকতলা, কলকাতা

কমিক্স কাহিনী: নারায়ণ দি গ্রেট

ফ্যান্টম, ম্যানড্রেক, স্পাইডারম্যান এদের সবাইকে তো তুমি চেনো। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি, তুমি কি এমন এক সুপার হিরোর নাম বলতে পারো যে বাংলায় কথা বলে, আর নানারকম বীরত্বের কান্ড ঘটায়...অন্যান্য গুরুগম্ভীর সুপার হিরোরা এই বাঙালি সুপার হিরোর কাছেও আসে না! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার অনুমান একেবারে ঠিক! সে আর কেউ নয় - বাঁটুল দি গ্রেট!! এইয়া চওড়া ছাতি তার; গুলি-গোলা-বোমা-রকেট, কিছুই তাকে কাবু করতে পারে না। উলটে বাঁটুল ই চোর ডাকাত গুন্ডা বদ্মাশদের ধরে পুলিশকে সাহায্য করে। তার পরনে সব সময় একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো হাফ-প্যান্ট। বাঁটুলের গল্প তো তুমি বইতেই পেয়ে যাবে, আর এখন তো অনলাইনেও পড়তে পারো। আমার কাছে শোনার থেকে বরং তুমি আরো নিজেই পড়ে ফেলো না...আরো বেশি মজা পাবে। বাঁটুল গি গ্রেট এর অনেকগুলি সংকলন আছে। যেকোন একটা হাতে নিয় দেখতে পাবে বড় বড় রংচঙে হরফে লেখা আছে বাঁটুল দি গ্রেট এর নাম, তার ঠিক তলায় আছে আরেকজনের নাম। তিনিই তো বাঁটুলের ছবি এঁকেছেন আর তাকে নিয়ে লিখেছেন নানা গল্প। আজ আমরা গল্প করবো তাঁকে নিয়ে - তিনি নারায়ণ দেবনাথ।

ছোটবেলা থেকেই ছোট্ট নারায়ণের ছিলো আঁকার ঝোঁক। পারিবারিক ব্যবসা ছিলো সোনার গয়নার দোকান। কিশোর নারায়ণ মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়ে নানারকম নক্সা দেখতো। ভালো ছবি পেলেই সে দেখে দেখে এঁকে ফেলতো। তার এই আঁকার ঝোঁক বাড়ির লোকেদের চোখ এড়ায়নি। ষোলো-সতেরো বছর বয়সে প্রথম তাকে আঁকার স্কুলে ভর্তি করা হয়। দুই তিন বছর পর সেই স্কুলটি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের সাথে এক হয়ে যায়। নারায়ণ ও মন দিয়ে আঁকতে থাকে ল্যান্ডস্কেপ আর ফিগারস।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাদ সাধলো। কলেজের শেষ পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না। তাই সার্টিফিকেট ও পাওয়া গেলো না। এমনিতেই তখনকার দিনে সবার ধারণা ছিলো যে ছেলে আর্ট কলেজে পড়ে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু একটুও দমে না গিয়ে এবার নারায়ণ কাজ খুঁজতে থাকলো। সেই সময় আঁকিয়েদের আর কে কাজ দেবে, কার্টুনও কেউ আঁকতো না। শৈল চক্রবর্তী, প্রতুল চন্দ্র লাহিড়ীদের মতো প্রতিভাবান কার্টুনিস্টদের তেমন ভাবে কেউ চিনতো না বা উৎসাহ দিতো না। যাইহোক, নারায়ণ

দেবনাথের হাতেখড়ি হয় বিজ্ঞাপনের স্লাইড-শো দিয়ে। এগুলো দেখানো হতো সিনেমা হলে বিরতির সময়। এছাড়াও বাণাটে হতো নানারকম জিনিষের লেবেল। এই সব করতে করতেই সে পৌঁছে যায় দেব সাহিত্য কুটিরের অফিসে।

সেখানে তাকে ছোট খাটো ছবি আঁকার কাজ দেওয়া হতো। আর নারায়ণের ও তো বহুদিনের ইচ্ছা ছিলো দেব সাহিত্য কুটিরের সাথে কাজ করার। তখন বাংলা ভাষার নিজস্ব কমিক্স বলতে মোটে একটি- শেয়াল পন্ডিত। প্রতুল চন্দ্র লাহিড়ীর আঁকা এই কমিক স্ট্রীপটি বেরোতো যুগান্তর দৈনিক পত্রিকায়। বিদেশি কমিক্সের রমরমাই বেশি। কিন্তু শেয়াল পন্ডিতকে সবাই পছন্দ করতো। দেব সাহিত্য কুটির থেকে নারায়ণ দেবনাথকে বলা হলো যদি হাঁদা-ভোঁদা নাম দিয়ে কিছু করা যায় -শুরু হলো সাদা-কালোতে আঁকা দুটো ডানপিটে ছেলের গল্প। রোগা হাঁদা আর মোটাসোটা ভোঁদার নানারকমের দুষ্টুমির গল্প পড়ে ছোটরা তো আনন্দ পেলোই, বড়রাও হাসতে হাসতে মাত!

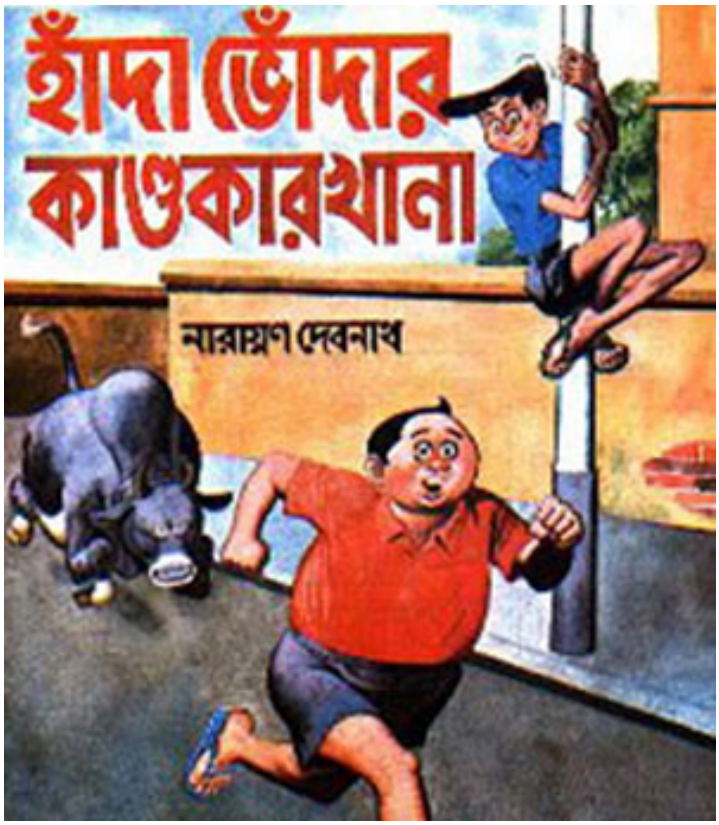

তাই সাদা-কালো কমিক্সের পর রংচঙে কমিক্সের ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গেলো। একদিন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর মাথায় এসে যায় অদ্ভূত এক নাম - বাঁটুল দি গ্রেট! আর নামটা মনে হওয়ার সাথে সাথেই বাঁটুলের ছবিও মনে মনে তৈরি করে ফেললেন। ব্যস, এসে গেলো এক বাঙালী সুপার হিরো। কিন্তু প্রথম দিকে তেমন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। এমন সময়ে শুরু হলো বাংলাদেশের যুদ্ধ। সবাই যুদ্ধের নানান আলোচনায় মত্ত। দেব সাহিত্য কুটিরের নির্দেশে, নারায়ণ তখন বাঁটুল কে হাজির করলেন কামান, গুলি-গোলা, প্লেন এইসব নিয়ে। যুদ্ধের এইসব সরঞ্জাম বাঁটুলের কিছুই করতে পারেনা। সে একাই একশো। আর তার সাথে ছিলো বাচ্চু আর বিচ্ছু নামের দুটো অসম্ভব দুরন্ত ছেলের ভয়ানক দুষ্টুমি। তারা বাঁটুলের সাথেই থাকে। এইবার কিন্তু সবার মধ্যে সারা ফেলে দিলো

বাঁটুল।

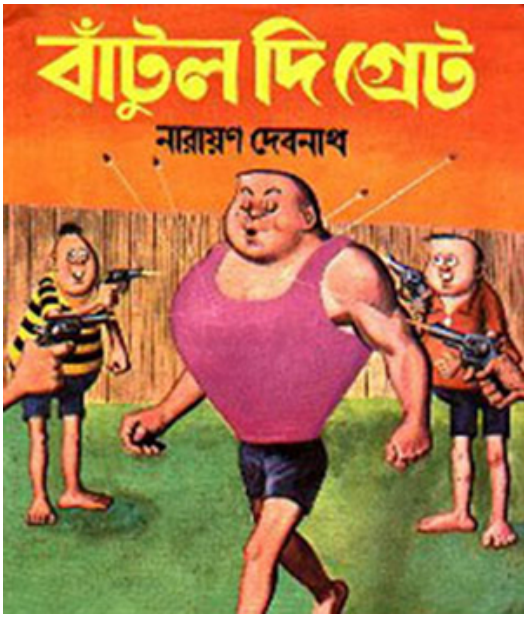

এরপর নারায়ণ দেবনাথের যোগাযোগ হয় কিশোরভারতী পত্রিকার সাথে। ব্ল্যাক ডায়মন্ড ও ইন্দ্রজিৎ নামে এক বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের ছবি আঁকেন তিনি। এরপর পত্রিকার সম্পাদক দীণেশ চন্দ্র রায় তাঁকে নতুন কমিক্ স্ট্রিপ তৈরি করার কথা বলেন। নারায়ণ তৈরি করলেন পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান। সে ম্যাজিক কে কাজে লাগিয়ে চোর ডাকাত ধরে। কিন্তু দীনেশবাবু আসলে হাঁদা-ভোঁদার মতো কিছু একটা চাইছিলেন। নন্টে-ফন্টের উদ্ভব এইভাবেই। এরা দুই বন্ধু থাকে স্কুল বোর্ডিংএ। এদের হস্টেল জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে চলতে থাকলো এই কমিক্সগুলি। এই গল্পগুলির আরেক প্রধান চরিত্র হলো কেল্টুদা, যে কিনা বোর্ডিংএ নন্টে-ফন্টের সঙ্গে থাকে। কেল্টুদা সবসময় নন্টে-ফন্টেকে বোকা বানানোর অথবা বিপদে ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু উলটে শেষ পর্যন্ত নিজেই ফাঁদে পড়ে। আর আছেন হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। বিশাল মোটা এই চরিত্রটির সঙ্গে হাঁদা-ভোঁদার পিসেমশাইএর চেহারার খুব মিল।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, বাংলা কমিক্সের নাম বলতে গেলে প্রথমেই নারায়ণ দেবনাথের কথা বলতে হবে। তাঁর মতে, কমিক স্ট্রিপ বা কার্টুন তৈরি করতে গেলে, আঁকা এবং লেখার ক্ষমতা ছাড়াও

দরকার উপস্থিত বুদ্ধির আর সঠিক কৌতুকবোধের। আজ তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু কাজ করা থামেনি। তাই বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টে দের নতুন নতুন কান্ড-কারখানার ছক তৈরিতে তিনি আজও সমান ব্যস্ত। তাই তো তিনি নারায়ণ দ্য গ্রেট!!

লেখাঃ
পূর্বাশা
নিউ আলিপুর, কলকাতা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া
ল্যামবিয়েক

এক্কা-দোক্কা: ম্যারাথনের মোকাবিলা

ম্যারাথন দৌড় নাকি খুব লম্বা, তাবড় তাবড় দৌড় বীরেরাই নাকি শেষ করতে পারে না-এইসব বলে বন্ধুরা আমাকে খুব ভয় দেখিয়েছিলো।

কত লম্বা?

তা সে ২৬ মাইল ২৮৫ গজ, মানে ২৬ পূর্ণ ৭/৩২ মাইল, মানে কিনা ৪২ দশমিক ১৯৫ কিলোমিটার হবে। বাপরে!প্রাণের মধ্যে একটা বিষম খেলাম। তবে ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে,ম্যারাথনের চ্যালেঞ্জটা নিয়ে ফেলেছি। ফেদিপ্পিদেস বলে এক গ্রীক যোদ্ধা নাকি ম্যারাথনের যুদ্ধে ওই রকম দৌড়ে গতায়ু হয়েছিলেন। এরপরে কি আমার পালা? আর তাও তো উনি পুরোটা দৌড়োন নি,১৮৯৬ সালের অলিম্পিকেই যখন এই দৌড় অন্তর্ভূক্ত হলো তখন অবধি তাঁরা দৌড়োতেন মোটে ২৪ দশমিক ৮৫ মাইল।

সাতপাঁচ ভেবে দেখলাম গভীর জলে যখন পড়েইছি তখন একটু হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরানোর চেষ্টা করি। এই ভেবে ম্যারাথন নিয়ে ভারী পড়াশুনো করতে লাগলাম আর লেংটির মতো একটা হাফ প্যান্ট কিনে ফেললাম। অথচ এত কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও আমার দৌড়ের কোনো উন্নতি হলো না। ঠিক এমন একটা সন্ধ্যাবেলায় ম্যারাথনের কথা ভাবছি আর উলটো দিকের দোকান থেকে এই ভরা বৃষ্টিতে কিছু তেলেভাজা আনার উদ্যোগ করছি, এমন সময় সেই কনকনে ঠান্ডা বাতাস আর ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে আমার এক বন্ধু এসে বললো-কিরে দৌড়তে যাবি? নাকি আজকের প্র্যাকটিস অলরেডি হয়ে গেছে? তোর তো সামনে আবার ম্যারাথন। এইসব কথা শুনে বড়ই বিপদে পড়লাম। মনে মনে

নিজেকে ছি ছি করে বেরোলাম জাহাজঘাটার সামনেটায় দৌড়োতে। কিন্তু দৌড়োবো কি? হাঁসফাঁস করছি, শীত লাগছে, আঙুল অবশ হয়ে গেছে, কানের লতিতে যন্ত্রণা করছে, কোমর চুলকোচ্ছে, নাকের ডগা অসাড়,মনে হচ্ছে এক্ষুণি ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলি। কিন্তু লোকজনের সামনে তো এসব চলে না, কোনোক্রমে কিছুদূর গিয়ে আর পারছি না বলে দু-ঘন্টা বাদে দাঁড়িয়ে পরে দেখি সবে কুড়ি মিনিট হয়েছে। মাথা মুছতে মুছতে ভাবলাম,এবারে কিছু একটা করতেই হচ্ছে, দৌড়ের আর মোটে আড়াই মাস বাকি।

দেখলাম রাতে একা শীতের মধ্যে দৌড়োনোর আইডিয়াটা ভালো। শুধু ঠান্ডা না লাগলেই হলো। এটা সেই ভদ্রলোকের মতন, যিনি নাকি সব সময় এক সাইজ ছোটো চটি কিনতেন যাতে বাড়ি ফিরে চটিটা ছাড়তে ভারি আরাম লাগে। আমারও তেমনি, কষ্টের মধ্যে দৌড়লে আসল দিনে হেসে খেলে বেরিয়ে যাবো। শুরু হল দৌড়। কুড়ি মিনিট থেকে পঁচিশ মিনিট,তারপরে আধ ঘন্টা, একঘন্টা-আস্তে আস্তে সময় বাড়াচ্ছি-রোজই একটা জায়গায় এসে মনে হয়, আর না, এইবারে ঠিকরে পড়বো, সেইখানে চোখের জলে নাকের জলে এক হয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবে শেষ করি। ইতিপূর্বে একবার দুম করে প্রচুর দৌড়োতে গিয়ে হাঁটুতে টান লেগে দেড় মাস কিছু করতে পারিনি। আর আরেকবার জিমে দৌড়োতে গিয়ে পায়ের বারোটা বাজাতে বাকি রেখেছিলাম। জিমে দৌড়ানোর মেশিন যে পায়ের পক্ষে কি খারাপ সে আর কি বলবো। পয়সা দিয়ে পায়ের লোকসান। তার চেয়ে রাস্তায় গাড়ি চাপা না পড়ে দৌড়ানো ভালো। সবচেয়ে ভালো নাকি ঘাসে দৌড়ানো। কিন্তু আমি ঘাস পাচ্ছি কোথায়? জ্ঞানের কথা থাক, একদিন শনিবার ভোরে ভাবলাম একটা লম্বা দৌড় দেয়া যাক। দৌড়োতে দৌড়োতে কখন যে ফিরেছি তার তার খেয়াল নেই, দম প্রায় শেষ, মাথা কাজ করছে না, রাস্তার ধুলো ধোঁয়ায় মুখে এক পরতা কালি পড়ে গেছে, চোখে ঘাম ঢুকে জ্বালা করছে। পা গুলো মনে হচ্ছে আর পায়ের জায়গায় নেই। ঘড়িতে দেখলাম তিন ঘন্টা দশ মিনিট। নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ালাম শাবাশ! শাবাশ!

ভরসা হলো। আমিও হয়তো শেষ করবো। ঘন্টার পর ঘন্টা হা হাঁ করে দৌড়োলেই কিন্তু চলে না। ওটা করতে গিয়েই প্রতি একশোটার মধ্যে অন্তত পঁচিশটা লোক শেষ করতে পারে না। প্রায় স্লো মোশানে শুরু করে বডি ধীরে ধীরে গরম করে এমন স্পীড নিয়ে যেতে হবে যে তখন আর নতুন করে কোন কষ্ট হবে না। রাস্তা যত ঢালে যাবে গতি তত বাড়বে আর চড়াই যত হবে গতি তত কমবে। হাঁফ ধরলেই দৌড়োতে দৌড়েতেই রেস্ট। আর ক্ষিদে তেষ্টা তো একটু একটু আছেই। বেশি খাবার বা জল খেয়ে কত লোক যে বমি করে ভাসিয়ে দেয় তার ইয়ত্তা নেই। আবার কিছু লোক ঠিক তার উলটো, জল-খাবার কিছুই খায় না ফলে কিছুক্ষণ পরে মাথা ঘুরে মাটিতে ঠিকরে পড়ে। ওই সময় চিনি জাতীয় জিনিসে খুব চট করে এনার্জি পাওয়া যায়। তাই হাঁটতে হাঁটতে এক মিনিটে অল্প জল আর কিশমিশ, বা ছোট চকোলেট খেলে মনে হয় যেন ভেতর থেকে কেউ একটা ব্যাটারি চালু করে দিলো। ওই এক মিনিটে কিচ্ছু সময় নষ্ট হয় না। বরং মনে হয়, এই তো, এইবারে অনায়াসে আরও আধ ঘন্টা দৌড়ে নেবো। কিন্তু সাবধান, বেশি দৌড়োলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা হুহু করে কমে যায়। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই এই সময়ে জ্বর, সর্দি কাশি, পায়ে চোট। তাই পা যদি বলে, শোনো, আর পারছি না, তাহলে তার কথা শুনে হাল্কা দেওয়াই ভালো। কুড়ি মাইলের পর পায়ের কথা শুনে লোকজন খামোখা স্পিড বাড়াতে গিয়ে মাটিতে পড়ে থেকে হাহুতাশ করে। আর একবার থেমে গিয়ে পা যদি জমে যায়, তবে সব পন্ড।

আমি দেখে চেনার চেয়ে ঠেকে শিখি বেশি।তাই একগাদা ভুলচুক করে আর তার খেসারত দিয়ে

শেষমেষ দৌড়টাকে একটা পর্যায়ে এনে ফেললাম। এমনকি দৌড়ের আগের রবিবার কুড়ি মাইল দৌড়ে দেখলাম, হ্যাঁ, কষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু পারছি। তারপরে এক সপ্তাহ টুকটাক সাঁতার এইসব-ওতে চোট লাগে কম। ম্যারাথনের আগের রাতে তেড়ে ভাত খেলাম। ওটাই আমাকে পরের দিন গ্লাইকোজেন হয়ে পেশীতে চটজলদি এনার্জি দেবে। খুব মন দিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম যে আমি হাসতে হাসতে দু আঙুলে ভিকট্রি সাইন দেখিয়ে লাইন পেরোচ্ছি। তখনো বুঝিনি কপালে কি আছে।

দৌড়ের দিন ভোরবেলা, বাতাসের তাপমাত্রা শূণ্য কি এক ডিগ্রি হবে,প্রায় দশ হাজার লোক জমায়েত হলো। মাইকে সেকি চিতকার, কি হট্টগোল। চতুর্দিকে বিজ্ঞাপন, সবাই বাঁশি বাজিয়ে প্রতিযোগিদের চিয়ার আপ করছে। আমরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গা ঘষে চিয়ার আপ হচ্ছি, না দৌড়লে ভীষণ শীত। ঠিক সাড়ে আটটায় বন্দুকের শব্দ হলো-আর আমরা কয়েক হাজার লোক হো...ও...ও...শব্দ করে দৌড়োতে শুরু করলাম। ম্যারাথনের মজা হল সবাই সঙ্গে থাকলে কষ্ট কম হয়, মজা লাগে। আর এইভাবে দৌড়ে একটা শহরের কত জায়গা যে দেখা হয়ে যায় তা আর বলার কথা না। এমনিতে অনেকক্ষণ দৌড়োলে মাথা ফাঁকা থাকে, সময় অনেক স্লো লাগে, তাই নানান হাবিজাবি চিন্তা করতে করতে দৌড়োলে দিব্যি টাইম কাটে। খালি দুম করে আলটপকা কোথাও পা হেলে বা ঘুরে যাতে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। এরমধ্যে আবার ছুটকো-ছাটকা মজা হচ্ছে। একটা ব্রিজের তলা দিয়ে যেতে যেতে একশোটা লোকের চিতকার দিয়ে যে দারুন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা যায় সেটাই জানতাম না। কোথাও কোথাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একগাদা বাচ্চা আমাদের হাত ছোঁবে বলে সার বেঁধে জমায়েত হয়েছে। কেউ কেউ আবার দৌড়ের লাইনের ঠিক সাইডে মুসাম্বি বা কোনো ফল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর এইসব মজার মধ্যে সবাই জানে, যে জলের স্টেশন প্রতি তিন মাইলে একটা। আর বাথরুম হলো ছয়ে এক।

প্রথম পনেরো কিলোমিটার তো এইসব ভাবতে ভাবতেই কেটে গেলো। মনে হলো, গা গরম হচ্ছে না। আর তখনই সেই ভুলটা হলো। আমার পাশ দিয়ে দু-তিন জন পক্ককেশ বৃদ্ধ সাঁ সাঁ করে আমাকে

আগেই পেরিয়েছিলেন। তাতে মনে হয় আমার মনে একটু ব্যাথা লেগেছিলো। কিন্তু সাড়ে চার ফুট লম্বা, মানে বেঁটে,মাথায় ব্যান্ডানা বাঁধা এক বুড়ি যখন পনেরো কিলোমিটারে আমায় উল্কার বেগে অতিক্রম করলেন তখন আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে গেলো...সুপারম্যান হবার ইচ্ছে হল। নিজের কথা না ভেবে মনে মনে বুড়ির সঙ্গে কম্পিটিশান শুরু করলাম। বুড়ি স্পিড বাড়াচ্ছে, আমিও বাড়াচ্ছি। মনে মনে কে যেন বলছে, যে পরে মহা ফ্যাসাদে পড়বো। কিন্তু থামতে পারছি না। পঁচিশ কিলোমিটারের মাথায় এই সার সত্যটা আবিষ্কার করলাম যে বুড়ি পোড় খাওয়া দৌড়বীর। ওনাকে ধরা আমার সাধ্যের বাইরে। এইভেবে যেই একটু দম ছেড়েছি অমনি টের পেলাম যে আমার দম একেবারে বেরিয়ে গেছে। আমি এসেছি মোট অর্ধেকের একটু বেশি রাস্তা। আর একশো মিটারও যেতে পারবো কিনা সন্দেহ। এই অবস্থাকে ম্যারাথনে নাকি বলে-হিটিং দা ওয়াল। সামনে একটা দেওয়াল যেটা পেরোনো অসম্ভব। আমার মুখ দেখে বোঝাই যাবে না যে আর এক মিনিটের মধ্যে আমি বসে পড়বো। তারপরে পায়ে খিঁচুনি শুরু হবে,এম্বুলেন্সে করে তুলে নিয়ে যাবে - কি লজ্জার ব্যাপার।

ঠিক এইরকম সময় শুনি বিক্রম!বিক্রম! চালিয়ে যা! বলে চিতকার। কি আনন্দ-কি দৃশ্য। সব বন্ধুরা দেখি ওই এলাকাতেই প্রতি মাইল দু মাইলে একজন দুজন করে দাঁড়িয়েছে। ওরা ঠিক জানে যে এইরকম কোনো একটা জায়গাতেই আমি কুপোকাত হতে পারি। ওদের লাফালাফিতে আমার শরীরে বল ভরসা ফিরে এলো। আবার দৌড়োতে লাগলাম। উঁচু রাস্তা, নিচু রাস্তা, ব্রিজ, কোথাও থামলাম না। কুড়ি মাইলের পর এক মহা উতপাত শুরু হলো। লোকে খালি তালি দেয় আর বলে, আরে শাবাস...শাবাস...দৌড় প্রায় শেষ, এই তো আর একটু। মুশকিল হলো এই যে দৌড় মোটেই প্রায় শেষ নয়। আরো প্রায় নয় কিলো মিটার বাঁকি। কিন্তু মন কি আর তখন মনের মধ্যে আছে? মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যে আমি বোধহয় একটা মাইলপোষ্ট দেখতে না পেয়ে মিস করে গেছি, তাই এত সময় লাগছে। পরের মাইলপোষ্টে গিয়ে ভুল ভাঙে। ততক্ষণে আমার চারিদিকে নানা কারণে ও অকারণে লোকে শয্যাশায়ী হয়েছে,এম্বুলেন্স এসেছে ইত্যাদি। বাইশ মাইল নাগাদ, পাদুটো তখন কি করে চলছে কে জানে, হঠাত বুঝলাম যে আমার একটু বাথরুমে যাওয়া উচিত ছিলো। অতি ক্ষীণ ধারায় আমার প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে, নেহাত গাঢ় রঙ বলে প্যান্টের সাথে তফাত করা যাচ্ছে না। সে কি কান্ড-এইরকম প্রায় মাইল দুয়েক চললো। আবার দু মাইলে শুকিয়েও গেলো।

শেষ দু মাইল দৌড় যে কি অসহ্য কষ্টের সে কেবল নানা লোকের লেখাতেই পড়েছিলাম। এবার হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। পঁচিশ মাইলের মাথায় দেখি ডান দিকে ঘুরেই আমাদের ফিনিশ লাইন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেই ঢুকতে যাবো, দেখি আরও সোয়া এক মাইল ওই লাইনের ঠিক পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাইন পেরিয়ে গেছি কিন্তু রেস শেষ হয়নি। এই কষ্টটা আর নেওয়া গেলো না। পুরোটা ঘুরে মুখ কুঁচকে প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে কাতরাতে কাতরাতে লাইনে ঢুকলাম। আমার হিরো হীরালালের মতো প্রবেশের আশা একেবারেই মাটি। ঢুকে যেই না থামা, পা দুটো একেবারে জমে গেলো, হঠাত প্রচন্ড শীত করতে লাগলো। ঠক ঠক করে কাঁপছি, আর মনে হচ্ছে যেন পায়ের নিচের মাটি তখনও নড়তে নড়তে এগোচ্ছে। অবস্থা বিপাক দেখে দু তিনজন স্বেচ্ছাসেবী আমায় তাপ নিরোধক রাংতা দিয়ে জড়িয়ে পায়ের পরিচর্যা করতে লাগলেন, মালিশ ওষুধ এইসব দিয়ে। পনেরো মিনিট বাদে পা ছাড়লো। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেডেল আনতে যাওয়া। কতক্ষণ সময় লাগলো? পাক্কা সাড়ে চার ঘন্টা। আর যে ফার্স্ট হলো, তার সময় দু-ঘন্টা নয় মিনিট, ভাবা যায়?

আমার পায়ের ব্যাথা শেষ পর্যন্ত মরলো দু-হপ্তা বাদে। দৌড়ের ছবি গুলো পেলাম এক মাস বাদে।

দেখে মনে হচ্ছে যেন এখনি দুম করে পড়ে যাবো। ওই বাইশ থেকে পঁচিশ মাইলের মধ্যেও ছবি আছে। মন দিয়ে প্যান্টের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। না বলে দিলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

লেখাঃ
বিক্রম
ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়
আহমেদাবাদ, গুজরাত

আঁকিবুকি

মালিকা দত্ত, নয় বছর, সাউথ পয়েন্ট স্কুল, কলকাতা

সৃজনী ঘোষ, আট বছর, বি ডি মেমোরিয়াল স্কুল